HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

টপিক – ০১ প্রারম্ভিক আলোচনা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: প্রারম্ভিক আলোচনা

টপিক ০২: মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

টপিক ০৩: গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

টপিক ০৪: মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

টপিক ০৫: অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৭ : বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: প্রারম্ভিক আলোচনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

প্রারম্ভিক আলোচনা

ভারতবর্ষ নামকরণ

ভারত এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। মূলত বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য ভারতবর্ষ ভারত উপমহাদেশ নামে খ্যাত। ভারতবর্ষের নামকরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত রয়েছে। যেমন-

ক. অনেক ঐতিহাসিকের মতে, পৌরাণিক যুগের সাগর বংশের সন্তান রাজা ভরতের নাম থেকে ভারত বা ভারতবর্ষ নামটি এসেছে। কথিত আছে, এ অঞ্চল রাজা ভরতকে দান করা হয়েছিল বলে এর নাম হয় ভারতবর্ষ।

খ. বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেশের নাম ভারতবর্ষ এবং এ দেশের মানুষকে অভিহিত করা হয়েছে ভারতসন্ততিরূপে।

গ. গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর মতে, ভারতে জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। সে কারণে ভারত নামের সঙ্গে বর্ষ শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয়।

ঘ. ঐতিহাসিক ড. রামশরণ শর্মার মতে, ভরত নামক এক প্রাচীন উপজাতির নাম অনুসারে এ দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে।

ভারতবর্ষ নামকরণ

প্রাচীন পারসিক লিপিতে 'সপ্তসিন্ধু'-কে বলা হয়েছে হপ্তসিন্ধু। এছাড়া প্রাচীন ফারসি সাহিত্যে 'সিন্ধু' শব্দটি 'হিন্দ' এবং 'সিন্দ' এ উভয় নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, গ্রিকরা ভারত আক্রমণ করতে এসে প্রথমে সিন্ধু অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়ে এ অঞ্চলকে ইন্দোই বা ইন্দাস (Indus) নামে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে 'ইন্দাস' শব্দটি থেকেই ইন্ডিয়া (India) শব্দের উৎপত্তি ঘটে। বিদেশিরা সিন্ধু তীরবর্তী বসবাসকারী অধিবাসীদের হিন্দু বলত এবং তার থেকেই হিন্দুস্তান কথাটি এসেছে বলে অনেকের ধারণা। অনেকেই মনে করে 'হিন্দু' শব্দ থেকেই হিন্দুস্থানের ব্যবহার। মূলত ভারতবর্ষ হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রধান হওয়ায় মুসলমানরা একে হিন্দুস্থান নামে আখ্যা দিয়েছিল এবং এ নামটি এখনও বহুল ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগের মুসলিম বিবরণীগুলোতে ভারবর্ষকে হিন্দুদের বাসভূমি হিসেবে 'হিন্দুস্থান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, হিন্দুদের বাসভূমি হওয়ায় এ অঞ্চলটি আজও হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধানে 'ভারত' নামটিই গ্রহণ করা হয়।

ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থান

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে ভারত উপমহাদেশ অবস্থিত। ভারত উপমহাদেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বদিকে হিমালয় পর্বতমালা, পূর্বদিকে মিয়ানমার (ব্রহ্মদেশ বা বার্মা) পশ্চিমে ইরান ও আফগানিস্তান এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটানের বিস্তৃত অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোক এ উপমহাদেশে বাস করে। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ১৪১,১৭,৭৩১,৩৫৩ জন। ভৌগোলিক দিক দিয়েও ভারতবর্ষ একটি বিচিত্র অঞ্চল। ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত দেশটিকে দুটি অসমান অংশে বিভক্ত করেছে। ভৌগোলিক দিক হতে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- উত্তর ভারত বা আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ। উত্তর ভারতে বহুবার বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে এবং এ অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল। ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা ও রীতিনীতির দিক দিয়ে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে গোটা ইউরোপের আয়তনের সমান ভারতবর্ষের আয়তন। আর ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে এটি ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। ওয়ালব্যাংক বলেন, “জাতি, ধর্ম ও ভাষার দিক হতে ভারতীয় উপমহাদেশ পৃথিবীর একটি জটিল এলাকা।" ভারতবর্ষে এখন বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাস।

প্রারম্ভিক আলোচনা

ভারতবর্ষে নৃতাত্ত্বিক বিবর্তন

ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতির বাস ছিল। দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী। এরপর আর্য, শক, কুষাণ ও হুনরা পর্যায়ক্রমে ভারতে আসে। ঐতিহাসিক হুইট বলেন, "ভারত উপমহাদেশকে একটি বিরাট জালের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং এতে এশিয়ার বিভিন্ন জাতি এবং জনগণ ভেসে এসে ধরা পড়েছে।" পৃথিবীর প্রধান পিঙ্গল, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ জাতির সমন্বয়, এ উপমহাদেশে সংঘটিত হয়। এরা অসংখ্য গোত্র এবং উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এখানে ১৭৯টি ভাষা, ৫৪৪টি আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। এ কারণেই আইরিশ ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) ভারত উপমহাদেশকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি বিদ্যমান থাকায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস বলেন, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে ভারতবর্ষে কমপক্ষে ১১৮টি রাজ্য ছিল।

ভারতবর্ষে নৃতাত্ত্বিক বিবর্তন

কালবিভাজন অনুযায়ী ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে রিন্যস্ত করা যায়। যেমন-

ক. প্রাচীন যুগ: মুসলিম বিজয়ের পূর্বের হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনামলকে ভারতীয় ইতিহাসে প্রাচীন যুগ বলা যায়।

খ. মধ্যযুগ: ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান থেকে শুরু করে মুঘল আমলের শেষপর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলা যায়।

গ. আধুনিক যুগ: ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা ধরা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতবর্ষে 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। অতঃপর ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান বিভক্ত হয় এবং স্বাধীন 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এভাবে ভারত উপমহাদেশ বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নামক তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত অংশকে আর্যাবর্ত বা উত্তরাপথ এবং বিন্ধ্যপর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অংশকে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ বলা হয়। ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে মোট পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক. উত্তরে হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল: হিমালয় পর্বত উত্তর ভারত থেকে তিব্বত ও চীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কাশ্মীর, সিকিম ও ভুটান এ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। পুরাণে এ অঞ্চলকে পর্বতাশ্রয়ীন বলে উল্লেখ আছে।

খ. সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল: হিমালয় থেকে উৎপন্ন সিন্ধুনদ, গঙ্গানদী ও ব্রহ্মপুত্র এ তিনটি নদীর অববাহিকার বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী উর্বর অঞ্চল। সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকায় প্রাচীন ভারতের সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল।

গ. মধ্যভারতের মালভূমি: সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের উত্তরের মধ্যবর্তী অংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ঘ. দাক্ষিণাত্যের মালভূমি: বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ থেকে কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত এ মালভূমি বিস্তৃত। কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি নদী এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত। এ মালভূমির পূর্বদিকে পূর্বঘাট ও পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিরাজমান।

ঙ. সুদূর দক্ষিণ: কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত অঞ্চলকে সুদূর দক্ষিণ বলা হয়। এ অঞ্চল হলো দ্রাবিড় সভ্যতার লীলাভূমি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

টপিক – ০৩ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

টপিক ০৩: মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

This Topic is important for

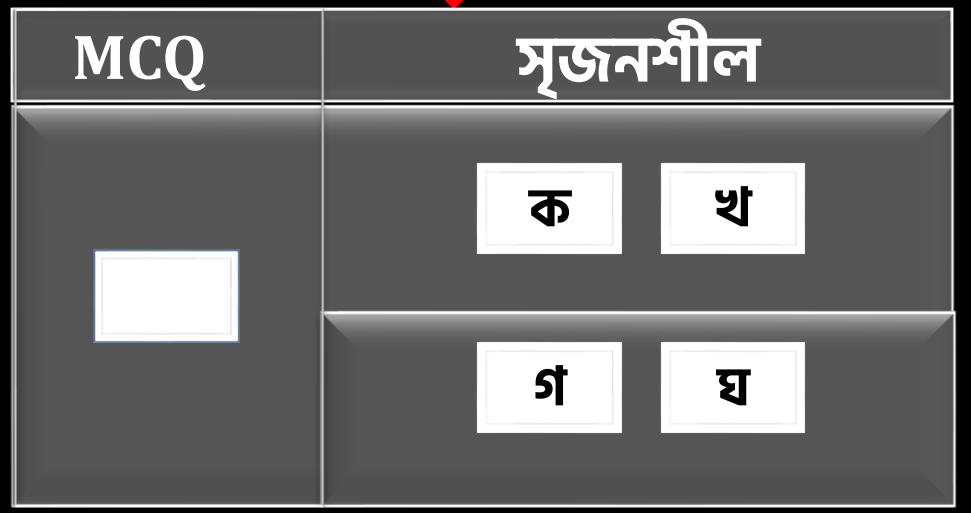

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন একজন উমাইয়া সেনাপতি। তিনি সৌদি আরবের তাইফের সাকিফ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতা কাসিম বিন ইউসুফ তার বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন। তার চাচা উমাইয়া গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে যুদ্ধ বিদ্যা ও সরকার পরিচালনা শিক্ষা দেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার নিজ কন্যাকে ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে বিবাহ দেন। মূলত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তার সিন্ধু জয়ের কারণে মুসলিমদের পক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

চিত্র : প্রাচীন ভারত

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেখানে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ছোট ছোট রাজবংশের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা শাসিত হতো। কাশ্মীর, কনৌজ, মালব, গুজরাট, সিন্ধু ছিল উল্লেখযোগ্য এলাকা। ভারতবর্ষের এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একে অন্যের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ভারতীয় ঐতিহাসিক ও গবেষক ভি. ডি. মহাজন বলেন, "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশে কোনো সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল না। ভারতবর্ষ ছিল রাষ্ট্রগ্রন্থি যার প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল।" ফলে কেন্দ্রীয় কোনো শক্তি না থাকায় এসব রাজ্যে অনৈক্য ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় থাকায় আরব মুসলমানগণ যখন সিন্ধু বিজয়ে অগ্রসর হয় তখন তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা একটি সংহত ও সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

মূলত ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজা হর্ষবর্ধন মৃত্যুবরণ করলে সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাসের আংশিক ঐক্য হর্ষের সঙ্গেই বিলুপ্ত হয় এবং এটি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে বহুলাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, যখন মুহাম্মদ ঘুরীর বিজয়ে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলো দিল্লি সুলতানদের কর্তৃত্বাধীনে আসে।" ব্রাহ্মণ চাচের পুত্র রাজা দাহির মুহাম্মদ বিন কাসিমের সামরিক অভিযানের সময় সিন্ধুর শাসনকর্তা ছিলেন। দেবল, নিরুন, সিওয়ান, সিসাম, ব্রাহ্মণাবাদ ও আলোর ছিল তার সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকা। আলোর (Alor) ছিল রাজধানী। রাজা দাহির জনপ্রিয় শাসক ছিলেন না।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থা: কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ ছিল অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। বাংলা ও গুজরাট বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ কৌটিল্যের বিবরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। যথা- ক. ভূমি রাজস্ব, খ. সামন্ত প্রভু ও জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত কর এবং গ. আবগারি ও বাণিজ্য শুল্ক। কৃষককে তার উৎপাদিত ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাষ্ট্রকে কর হিসেবে দিতে হতো।

মৌর্য ও গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই সন্তোষজনক। আর এ কারণেই এ আমলে সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিভিন্ন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হতে থাকে। এ যুগেই বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ততে এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এখান থেকে বঙ্গদেশের বণিকেরা বড় বড় জাহাজে সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করত। চীনা পর্যটক ফা-হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত ও নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। তবে সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাজা, ব্রাহ্মণ ও অভিজাতদের তুলনায় নিম্নবর্ণের লোকদের নিদারুণ কষ্টভোগ করতে হতো। কৃষককুল হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

সাংস্কৃতিক অবস্থা: ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ভারতীয়গণ শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সভ্যতায় যথেষ্ট উৎকর্ষতা সাধন করেছিল। বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম ভারতের বালভী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বারানসী, উদন্তপুর, বিক্রমশীলা, আজমির প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা হতো। এ যুগে প্রণীত 'ভগবতগীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর, জয়দেব, শ্রীহর্ষ প্রমুখ মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ অবদান রাখেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় 'হর্ষচরিত' প্রণেতা বানভট্ট, রাজতরঙ্গিনী রচয়িতা 'কলহন' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পশ্চিম ভারতের বল্লভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উদন্তীপুর বিক্রমশীলা ও বারানসিতে উচ্চশিক্ষা চালু ছিল। বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত তক্ষশীলায় বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

প্রশাসনিক অবস্থা: প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা। একচ্ছত্র একনায়কত্বই ছিল প্রশাসনের ভিত্তি। অর্থাৎ রাজ্যের রাজা সমস্ত ক্ষমতার উৎস হিসেবে রাজ্যশাসন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতেন। তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র কায়েম থাকায় রাজার উত্তরাধিকারী ছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র। রাজা সর্বেসর্বা হলেও রাজার একটি মন্ত্রিসভা ছিল। রাজকার্য নির্বাহে এ মন্ত্রিসভা পরামর্শ দিত। তবে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা ছিল এবং পরামর্শ গ্রহণে তিনি বাধ্য ছিলেন না। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজবংশে বিভিন্ন ধরনের রাজকর্মচারী নিযুক্ত হতো। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রখ্যাত কূটনীতিক এবং প্রশাসক কৌটিল্য বা চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' হতে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রশাসন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বে রাজধানী পাটলীপুত্রে শাসন পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক দপ্তর ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপ নির্মিত হয়। ইলোরার কৈলাশ মন্দির, অজন্তা গুহার দেয়াল চিত্রাবলি, কোনারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পল্লব, চালুক্য এবং চোলদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মন্দির ও ইমারত নির্মিত হয়। হিন্দু মন্দির ছিল হিন্দুধর্মের বহিঃপ্রকাশ। হিন্দু নৃপতিগণ পরকালের পাথেয় হিসেবে অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেন। এসময়ে ভারতীয়রা সংগীতবিদ্যা ও স্থাপত্য শিল্প নৈপুণ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল বেরুনি তার বিখ্যাত গ্রন্থে হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রশংসা করেছেন। এ সময়ে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। অধিকাংশ মানুষ নিরামিষভোজী ছিল। সমাজে অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

বিভিন্ন রাজকর্মচারী বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। যেমন- সন্ধিবিগ্রহিক (যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিচুক্তি সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রী), অক্ষপাটলাবিকায়িতা (দলিল রক্ষক মন্ত্রী), অস্পাত্র্য (অর্থমন্ত্রী), সুমন্ত (পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী), রাজপুরোহিত (ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী), প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিন্যাস দ্বারা সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমের ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে একজন প্রশাসক বা 'উপকারিতা' নিযুক্ত করা হয়। প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করা হয়। জেলাকে 'ভাষ্য' এবং জেলার শাসনকর্তাকে 'ভাষ্যপতি' বলা হতো। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর ছিল 'গ্রাম'। পঞ্চায়েত কর্তৃক গ্রামের শাসন পরিচালিত হতো।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা

ধর্মীয় অবস্থা: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে প্রধানত তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। যেমন- বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্ম। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্মের স্থূল আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে একটি ধর্মীয় বিপ্লব শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়। মহাবীর নামক এক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। আত্মার শুদ্ধি এবং জাতিভেদ প্রথার বিলোপ জৈনধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ছিল ভোগবিলাস ত্যাগ করে আত্মার শুদ্ধি লাভ, জীবে দয়া ও পুনর্জন্ম। বৌদ্ধধর্ম মৌর্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি অশোকের সময়ে বিস্তার লাভ করে। ভারতবর্ষ ছাড়াও নেপাল, চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, মোঙ্গলীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অন্যতম ধর্ম ছিল হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ। আর্যযুগে ঋগ্বেদের প্রভাবে দ্রাবিড়দের ওপর ব্রাহ্মণগণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপন করে। হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূর্তিপূজা। বৈদিক যুগেও অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করা হতো। সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি ছিল জাতিভেদ প্রথা

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পরোক্ষ কারণ

রাজ্য বিজয়: ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ওয়ালিদ দামেস্কের উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী খলিফা ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি মুসা বিন নুসাইর, তারিক বিন জিয়াদ, কুতাইবা, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রমুখ দক্ষ, যোগ্য, সমরকুশলী সেনাপতি লাভ করেন।

তিনি স্পেন, মধ্য এশিয়া এবং ভারত জয়ের আশা পোষণ করেন। সাম্রাজ্যবাদী গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় খলিফা ওয়ালিদের সমর্থনে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে আক্রমণ করেন এবং সাফল্য লাভ করেন।

ইসলাম প্রচার: ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত লাভের পর হতে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি জীবদ্দশায় একটি ইসলামি সাম্রাজ্য রেখে যান। এরপর প্রায় প্রত্যেক খলিফার শাসনামলে কোনো না কোনো অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে। সে সময় খলিফাগণ নতুন অঞ্চল দখল করা গৌরবের বিষয় ছিল। নতুন নতুন অঞ্চলে ইসলামের মহান সুশীতল বাণী পৌঁছে দেওয়াকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করতেন। মুসলিমরা ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পরোক্ষ কারণ

ধনসম্পদ অর্জন: প্রাচীনকাল হতে আরব বণিকদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ভারতের অফুরন্ত ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য বৈভবের সাথে আরব বণিকগণ পরিচিত ছিলেন। যাযাবর আরবদের স্থায়ী কোনো পেশা ছিল না। নতুন নতুন অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে গনিমত লাভ করা একটি অন্যতম পেশা ও নেশায় পরিণত হয়। খলিফাগণ মুজাহিদদের (ইসলামি যোদ্ধা) আর্থিক সচ্ছলতার বিষয় চিন্তা করে নতুন নতুন রাজ্যজয়ের অনুমতি দিতেন। এ কারণে আরবগণ ভারতে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।

ব্যর্থতাকে জয়: ৬৩৬-৬৩৭ এবং ৬৪৩-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মুসলিম সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু সমুদ্রপথে সামরিক অভিযান বিপজ্জনক মনে করে এরূপ যুদ্ধাভিযান স্থগিত করা হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রচেষ্টায় নৌবাহিনী গঠনের মাধ্যমে ৬৫৯, ৬৬২ এবং ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে, পর পর সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু মুসলিম সামরিক অভিযান আশানুরূপ সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি। অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানগণ ইবনে আল হারবি আল বাহিত্তির নেতৃত্বে মেকরান (আধুনিক বেলুচিস্তান) দখল করেন। মেকরান বা বেলুচিস্তান দখলের মাধ্যমে সিন্ধু বিজয়ের পথ খুলে যায়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পরোক্ষ কারণ

সিন্ধুর রাজনৈতিক অস্থিরতা: আরবরা সিন্ধু বিজয়ের পূর্বেই বুখারা, সমরকন্দ, ফারগানা দখল করেন। সর্বশেষ মেকরান বা বেলুচিস্তান দখল করেন। এসব অঞ্চল থেকে মুসলিম সমরকুশলিগণ সিন্ধুর ভেতর-বাইরে সবকিছুই অনুধাবন করেন। রাজা দাহিরের নিষ্ঠুরতা, জাঠ ও মেঠদের রাজ্যের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্ণপ্রথার কুপ্রভাব সর্বোপরি সামরিক দুর্বলতা মুসলিমদের জানা ছিল। অনুকূল পরিস্থিতি এবং জাঠ ও মেঠদের সহযোগিতার আশ্বাস আরবদের সিন্ধু আক্রমণে উৎসাহিত করে। ভি. ডি. মহাজন বলেন, "On the way, the Jats and Mids joined him against Dahir."

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাম্রাজ্যবাদী নীতি: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একজন দক্ষ, যোগ্য এবং কঠোর শাসক ছিলেন। তিনি যে প্রদেশের গভর্নর ছিলেন, সে প্রদেশে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শাসন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হেজাজ প্রদেশের কথা বলা যায়। খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামল ছিল মুসলিমদের সম্প্রসারণের যুগ। ইরাকের গভর্নর হিসেবে হাজ্জাজ পূর্বাঞ্চলের দেশজয়ের বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। মূলত হাজ্জাজের কঠোর সম্প্রসারণ নীতির কারণেই আরবগণ সিন্ধু আক্রমণ করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পরোক্ষ কারণ

সীমান্ত সুরক্ষা: খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে মুসলমানগণ মার্ড, হিরাত, সিজিস্তান, সিরাজ প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। অষ্টম শতাব্দীতে এসে মার্ভ থেকে বুখারা, সমরকন্দ, হিরাত থেকে বলখ মুসলমানগণ দখল করেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ছিল মেকরান। মেকরানের হিন্দু রাজাসহ পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজাদের নিকট মুসলিম সীমান্ত সুরক্ষিত ছিল না। তাই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মেকরান, সিন্ধু, মুলতান অঞ্চলগুলো দখলের সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

আরব বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন ইরাকের গভর্নর। তার কঠোর শাসনে কতিপয় ইরাকি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ বিদ্রোহীরা সীমান্ত পার হয়ে সিন্ধুরাজ দাহিরের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দূত মারফত রাজা দাহিরের নিকট বিদ্রোহীদের ফেরত চান। কিন্তু রাজা দাহির হাজ্জাজকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। নামে জামায়া

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পরোক্ষ কারণ

রাজা দাহির

আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। কারও মতে, আরবের সাথে সিংহল (বর্তমান নাম শ্রীলঙ্কা)-এর বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। সিংহলের কতিপয় আরব বণিক ব্যবসায় উপলক্ষ্যে এসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাদের পরিবারকে সিংহল রাজা জাহাজে করে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সিন্ধুর দেবল বন্দরে জাহাজগুলো জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিন্ধুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। আবার কারও মতে, সিংহলরাজ (শ্রীলঙ্কার রাজা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন উমাইয়া খলিফার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আটটি জাহাজে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ইরাকের প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু রাজা দাহিরের নিকট লুণ্ঠিত জাহাজগুলোর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু তার দাবি - সিন্ধুরাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হয়। আবার কারও মতে, খলিফা আল ওয়ালিদ ক্রীতদাসী - ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কয়েকজন অনুচরকে ভারতে প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পরোক্ষ কারণ

অনুচরগণ - কর্তৃক ক্রীতদাসী ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের পর ফেরার পথে সিন্ধুস্থ দেবল বন্দরে কতিপয় জলদস্যু কর্তৃক জাহাজগুলো - লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জাহাজগুলোর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন, কিন্তু তার দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। এছাড়া ভারত আগমনে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা বিধানে সিন্ধুর বিপক্ষে সামরিক অভিযান প্রেরিত হতে পারে। এককথায় বলা যায়, জলদস্যু - ও রাজা দাহিরকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সিন্ধুতে আরব অভিযান পরিচালিত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

যুদ্ধের ঘটনা

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে উবায়দুল্লাহ ও এর কিছু পরে বুদাইলের নেতৃত্বে দুটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দেই সর্বশেষ সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।

আরবদের সৈন্যসংখ্যা: ৬,০০০ (ছয় হাজার) সিরীয় ও ইরাকি সৈন্য, ৬,০০০ (ছয় হাজার) উষ্ট্রারোহী, ৩,০০০ ব্যাকট্রিয় ভারবাহী পশু এবং পরবর্তীতে মেকরানের কিছু মুসলিম, জাঠ ও মেঠদের অনেকে আরব দলে যোগ দেয়। এ যুদ্ধে আরবগণ মানজানিক বা বলিস্ত নামে এক প্রকার প্রস্তর নিক্ষেপক কামান ব্যবহার করে।আরবদের আগমনের পথ ও বিজয়ের ধারাবাহিকতা: আরব সেনাবাহিনী পারস্যের (বর্তমান ইরানের) রায়, সিরাজ শহর হয়ে মেকরানে (বেলুচিস্তান) উপস্থিত হয়। মেকরান হতে দেবল বন্দর দখল করে। দেবল বর্তমান পাকিস্তানের করাচি শহরের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বানবোর নামে পরিচিত। আরববাহিনী দেবল দখল করে নিরুন ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর দখল করে। রাওয়ার নামক স্থানে রাজা দাহিরের মূল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়। রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ব্রাহ্মণ্যবাদ, আলোর (সিন্ধুর রাজধানী) এবং মুলতান দখল করে।

সময়: ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তকাল (Spring Season) হতে ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। স্থান: দেবল। আরব সেনাপতি: মুহাম্মদ বিন কাসিম। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

যুদ্ধের ঘটনা

সময়: ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তকাল (Spring Season) হতে ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। স্থান: দেবল। আরব সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর।

যুদ্ধকৌশল: মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবলের পাশে (অনেকের মতে চারদিকে) পরিখা খনন করেন। দেবলে একটি বড় মন্দির ছিল। মন্দিরের উপরে একটি লাল পতাকা উড়ানো হতো। দেবলবাসীর ধারণা ছিল, এ পতাকা যতদিন উড়বে, দেবল ততদিন সুরক্ষিত থাকবে। আরবগণ এ তথ্য স্থানীয়দের মাধ্যমে জানার পর দুর্গের এ পতাকা ধ্বংস করেন। পতাকা ধ্বংসের ফলে ভীতিজনক অবস্থা তৈরি হয়। জনগণ হতাশায় নিমজ্জিত হয়। দেবলের শাসক ছিলেন রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র। যাহোক, আরবগণ যুদ্ধের মাধ্যমে দেবল দখল করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি একজন মুসলিম শাসক নির্বাচিত করে দেবল ত্যাগ করেন। তিনি দেবলে কিছু সৈন্যও রেখে যান।

নিরুন দখল: বর্তমান থাট্টা হতে হায়দরাবাদ সড়কের নিকটবর্তী একটি শহরের নাম নিরুন। 'নিরুন' শহরটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধানে ছিল। তারা বিনাযুদ্ধে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করে।

সেহওয়ান দখল: সেহওয়ান শহরের শাসক ছিলেন রাজা দাহিরের চাচাতো ভাই বজরা (Bajhra)। বজরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আরব বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

যুদ্ধের ঘটনা

রাজা দাহিরের সাথে যুদ্ধ সময় ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস। স্থান: রাওয়ার।

রাজা দাহিরের সৈন্য: ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)। আরব বাহিনীর বিপক্ষে রাজা দাহির প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। হাতিতে চড়ে রাজা দাহির যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু আরব বাহিনীর তীরের আঘাতে রাজা দাহির মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ওঠে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। পরবর্তীতে মাথায় তরবারির আঘাত পেলে তিনি (রাজা দাহির মারা যান' ২০ জুন, ৭১২)। রাজা দাহিরের স্ত্রী রানীবাঈ যখন দেখেন যে, পরাজয় অনিবার্য, তখন তিনি ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে রাওয়ার দুর্গে অবস্থান করেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রানীবাঈ-এর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রানীবাঈ যুদ্ধবন্দি হওয়া থেকে মুক্তি পেতে সকল নারীর প্রতি এক জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, "Our honour would be lost, our respite is at an end and there is nowhere any hope of escape; Let us collect wood, cotton and oil, for I think we should burn ourselves and go to meet our husbands."" অর্থাৎ, আমাদের সম্মান নিঃশেষ, আমাদের প্রাণদণ্ড অনিবার্য, পালানোর কোনো সুযোগ নেই। চল কাঠ, কার্পাস বস্ত্র এবং তেল সংগ্রহ করি। আমি মনে করি, আমাদের আত্মাহুতি দেওয়া এবং আমাদের স্বামীদের সাথে সাক্ষাৎ করা উচিত।

একটি বক্তব্য মতে, রানীবাঈ একটি বাসায় প্রবেশ করেন এবং নিজেদের জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দেন। এভাবে আরবগণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুরাজা দাহিরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

যুদ্ধের ঘটনা

ব্রাহ্মণাবাদ দখল: রাওয়ার দখল শেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হন। এ শহরের শাসক ছিলেন জয়সিংহ। জয়সিংহ মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। শহরবাসী আত্মসমর্পণ করে। শহরবাসীর জীবন, সম্পদ ও জমাজমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতাও দেওয়া হয়। শহরবাসী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জিজিয়া দিতে সম্মত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম মুসলিম সেনাদের ভালো ব্যবহার করার আদেশ দেন। তিনি বলেন, "Deal honestly between the people and the Sultan." এখানে রাজা দাহিরের অপর স্ত্রী লোদী এবং দুই কন্যা সূর্যদেবী ও পরিমল দেবী যুদ্ধে বন্দি হন।

আলোর দখল: আলোর ছিল সিন্ধুর রাজধানী। রাজা দাহিরের আরেক পুত্র কুফি তখন রাজধানীতে ছিলেন। তার সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কিছু সময় যুদ্ধ হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হন। এভাবে সিন্ধু বিজয় সুসম্পন্ন হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুলতান দখল

সিন্ধু বিজয় সুসম্পন্ন করে আরব বাহিনী মুলতানের দিকে অগ্রসর হয়। সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত (The Indus) উচ নামক দুর্গ দখল করে মুলতানের দুর্গের মূল ফটকে উপস্থিত হন। মুলতানের হিন্দুরা প্রায় দু' মাস যাবৎ প্রতিরোধ গড়ে তুলেও পরাজয় এড়াতে পারেনি। একসময় মুলতানও (৭১৩ খ্রি.) আরবদের দখলে চলে আসে। মুলতান দখলের সাথে রাজা দাহিরের গোটা রাজ্য আরবদের পদানত হয়। চাচনামা থেকে জানা যায়, দেবল হতে কাশ্মীর সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চল মুহাম্মদ বিন কাসিমের হস্তগত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাজ্যসীমানা ছিল এরূপ- পূর্বে কাশ্মীর, পশ্চিমে মেকরান, দক্ষিণে দেবল ও আরবসাগর এবং উত্তরে কারডন ও কাইকান পাহাড়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

মুলতান দখল

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু শুধু মর্মান্তিক নয়, বেদনাদায়কও বটে। তার মৃত্যু সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন- রাজা দাহিরের দুই কন্যা সূর্যদেবী ও পরিমল দেবীসহ বেশ কয়েকজনকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে দামেস্কে খলিফা সুলায়মানের দরবারে প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধবন্দিদের সাথে খলিফা সাক্ষাৎ করতে এলে কন্যাদ্বয় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন। খলিফা অগ্নিশর্মা হয়ে ঘোষণা করেন যে, পত্র পাওয়া মাত্র লবণ মাখানো গরুর চামড়ায় ভরে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে খলিফার দরবারে দ্রুত পাঠানো হোক। এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই অনুগত সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজেই খলিফার আদেশমতো লবণ মাখানো গরুর চামড়ায় নিজেকে মুড়িয়ে অন্যের দ্বারা সেলাই করে নেন। এর তিন দিন পর তিনি মারা যান। তার মৃতদেহ সুরুজ দেবী ও পরিমল দেবীর সামনে প্রদর্শন করলে তারা আবেগতাড়িত হয়ে সত্যতা ঘোষণা করেন যে, তারা মা-বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে খলিফা অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং রাজা দাহিরের দু' কন্যাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়ার লেজে বেঁধে টানতে আদেশ দেন। ভি. ডি. মহাজন ও ঈশ্বরীপ্রসাদ এ তথ্য তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক বালাজুরী ও ইবনে খালদুনের মতে, উক্ত কাহিনি ভিত্তিহীন ও অমূলক। মূলত খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের অকাল মৃত্যু ঘটে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সফলতার কারণ

৭১২ খ্রিষ্টাব্দে অভিযান পরিচালনা করে মুহাম্মদ বিন কাসিম মাত্র তিন বছরের মধ্যে সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলের মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ দ্রুত সফলতার মূলে বেশকিছু কারণ ছিল। নিচে প্রধান প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো-

রাজা দাহিরের নৈরাজ্য: রাজা দাহির ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক। তার কুশাসন ও নিপীড়নে প্রজারা এতই বিক্ষুব্ধ ছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু আক্রমণ করলে প্রজারা রাজা দাহিরকে কোনো সহযোগিতাই করেনি। বরং তার ঘৃণ্য ও বর্বরনীতির প্রতিবাদে অসংখ্য জাঠ ও মেঠ সৈন্য মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করে। এমনকি ব্রাহ্মণবাদ এবং নিরুনের ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণও মুসলিম আক্রমণের বিরোধিতা করেনি।

রাজা দাহিরের অদক্ষ সামরিক বাহিনী: রাজা দাহিরের সামরিক বাহিনী সুসংহত ছিল না। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় কেবল ক্ষত্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারত। ফলে তাদের সামরিক শক্তি খুবই দুর্বল ছিল। অপরদিকে, মুসলিম বাহিনীতে নতুন দেশ জয়ের নেশায় বিভিন্ন গোত্র, দেশ এবং মতাবলম্বী মুসলমানগণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের পতাকাতলে সমবেত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সিন্ধু শাসন

ইসলামের প্রেরণা: ধর্মপ্রচার এবং অর্থনৈতিক কারণে সাম্রাজ্য বিস্তার মুসলিম বাহিনীকে প্রেরণাদান করে। তৌহিদের বাণী প্রচার ও ইসলামি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ়তা এ বিজয়কে ত্বরান্বিত করে।

আরব বাহিনীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব: সিন্ধু বিজয়ের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আরব বাহিনীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। তুলনামূলকভাবে হিন্দু বাহিনী ছিল দুর্বল, শক্তিহীন; অপরদিকে, আরব বাহিনী ছিল সুসংঘবদ্ধ, সুসজ্জিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা: ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে সিন্ধু ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আকস্মিক আক্রমণে সিন্ধুরাজ দাহির অন্য কোনো রাজ্যের সহযোগিতা পাননি।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত কারণে আরবদের ভারত বিজয়ের পথ ত্বরান্বিত করেছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সিন্ধু শাসন

৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরব বাহিনীর সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে সিন্ধু ও মুলতানে আরব শাসন শুরু হয়। দীর্ঘ ১৫০ বছর আরবদের শাসন সেখানে বলবৎ ছিল। এ ১৫০ বছরে আরবদের একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা: মুহাম্মদ বিন কাসিম একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি বিজিত অঞ্চলকে কতকগুলো ইকতা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম উন্নত, উদার, বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি রাজা দাহিরের বেসামরিক প্রশাসনকে শুধু সংস্কার করেন। সিন্ধুর ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকার জন্য তিনি আপসনীতির মাধ্যমে স্থানীয়দের বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগ দেন। ব্রাহ্মণ এবং রাজা দাহিরের নিকটাত্মীয় ব্যক্তির উচ্চপদে নিয়োগ পেয়েছিল।

বিচারব্যবস্থা: প্রদেশ ও জেলায় কাজি-উল-কুজ্জাত নামে প্রধান বিচারক ছিলেন। মুফতি ইসলামি বিধানমতে আইনের ব্যাখ্যাদান, শাস্তি প্রদান ইত্যাদি কাজ করতেন। মীর আদল বিচারককে বিচার কাজে সহযোগিতা করতেন। হিন্দুদের ক্ষেত্রে স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মীমাংসা করা হতো।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সিন্ধু শাসন

রাজস্বব্যবস্থা: মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাজস্বব্যবস্থা উদার ছিল। তিনি রাজা দাহিরের নির্যাতনমূলক কর বিলোপ সাধন করেন। সিন্ধু ও মুলতানে ইসলামি রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ভূমিকর (খারাজ) এবং জিজিয়া (নিরাপত্তা কর) ছিল রাজস্বের অন্যতম উৎস। সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করলে ১/৪ ভাগ এবং সেচ ছাড়া ফসল উৎপাদন করলে ১/৫ ভাগ রাজস্ব দিতে হতো। অমুসলিমদের নিকট হতে জিজিয়া আদায় করা হতো। মুসলমানগণ জাকাত, সদকা দিত।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা: ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবগণ উদারতা, সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মকর্ম ও উৎসবাদি পালন করত। যুদ্ধকালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলো সংস্কার করা হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল

আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আরবেরা ১৫০ বছর সিন্ধুতে শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিঞ্চিৎকর হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টড (Todd Gray) আরবদের সিন্ধু বিজয়কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও একে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন না। স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, "আরবরা সিন্ধু বিজয় করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে এ বিজয় ছিল একটি উপাখ্যান মাত্র, একটি নিষ্ফল বিজয়।" রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে লেনপুলের মন্তব্যের কিছুটা যথার্থতা থাকলেও এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফলের ক্ষেত্রে তার মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। সার্বিকভাবে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল

রাজনৈতিক ফলাফল: মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের উপস্থিতির কারণে তিনি নববিজিত অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফাদের সুষ্ঠু এবং পরিকল্পিত নীতির অভাবও অনেকাংশে দায়ী। খলিফা আল ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) পরের উমাইয়া শাসকগণ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির পরিবর্তে শাসন সুদৃঢ় করার নীতি গ্রহণ করেন। ফলে আরবদের নতুন নতুন রাজ্যজয়ের উদ্যম, উৎসাহ ও বাসনা হারিয়ে যায়। দামেস্কের উমাইয়া খলিফাদের গোত্রকলহ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, গৃহযুদ্ধ, এককথায় উমাইয়া খলিফাদের দুর্বলতা সিন্ধু প্রশাসনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্টেনলি লেনপুল বলেন, "The Arabs had conquered Sindh but the conquest was only an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results." অর্থাৎ, “ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র, এটি ছিল একটি নিষ্ফল বিজয়।” সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল নেতিবাচক হলেও বলা যায়, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সূত্র ধরে ভবিষ্যতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। মনে করা যেতে পারে যে, সিন্ধু বিজয়ই ছিল তাদের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল

ধর্মীয় ফলাফল: মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর বিধর্মীদের ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। কতিপয় পির, দরবেশ, আউলিয়া ইসলাম প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র.), চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামি (র.), আজমির শরিফের খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (র.), ঢাকার শাহ আলী (র.), বগুড়ার মাহমুদ মাহি সাওয়ার (র.), বাগেরহাটের খানজাহান আলী (র.), রংপুরের হযরত কারামত আলী (র.), সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.), শাহপরাণ (র.) প্রমুখ অন্যতম। এসব আউলিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দলে দলে নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় ইসলামের পতাকাতলে হাজির হয়।

ভারতীয় ইতিহাসবিদ এ. এল. শ্রীবাস্তব তার The Sultanate of Delhi' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "সিন্ধু বিজয়ের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছিল।" ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক টমাস আরনল্ড (Thomas Arnold) বলেন, "ধর্ম প্রচারক ও বণিকদের নীরব প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার ঘটে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ঃ কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল

সামাজিক ফলাফল: সিন্ধু বিজয়ের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। আবার সিন্ধুবাসীর দৈনন্দিন জীবনেও আরবীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা দূর করতে আরবীয় রীতিনীতি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

অর্থনৈতিক ফলাফল: সিন্ধু বিজয়ের পূর্ব হতে আরবদের ভারতবর্ষে যাতায়াত ছিল। সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরবগণ সমুদ্র-বাণিজ্যপথ দিয়ে বাংলায় আসে এবং মাঝে মাঝে তারা সন্দ্বীপ ও রহুমিতেও আসত। সিন্ধুর রাজধানী আলোর ছিল ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। দশম শতাব্দী পর্যন্ত চট্টগ্রামেও আরব বণিকদের বসবাস করতে দেখা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

টপিক – ০৩ গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

টপিক ০৩: গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

৭১২ খ্রিষ্টাব্দে আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজিত হয়। এটি ছিল ভারতীয় ভূখণ্ডে মুসলমানদের প্রথম রাজ্য জয়। মুসলমানদের এ রাজ্য জয় কেবল সিন্ধু ও মুলতানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসব অঞ্চলে মুসলিম শাসন অক্ষুণ্ণ থাকলেও বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্য কোথাও মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়নি। সিন্ধু বিজয়ের প্রায় ৩০০ বছর পরে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান শুরু করেন। এ নতুন অভিযানের নায়ক ছিল গজনির তুর্কিরা। এ তুর্কিরা ছিল নবদীক্ষিত মুসলমান। তাদের বাসস্থান ছিল আফগানিস্তান। জাতি হিসেবে তুর্কিরা ছিল দুর্দমনীয় ও দুর্ধর্ষ। গজনিতে, তুর্কিরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এখান থেকে তারা ভারতবর্ষে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে। তাদের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম পাঞ্জাব বিজিত হয়। পরে অন্যান্য স্থানে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত হতে থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে, তাদের প্রচেষ্টার ফলেই একদিন সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন বলেন, "However the work started by the Arabs was completed by the Turks." অর্থাৎ "যা হোক, যে কাজ আরবদের দ্বারা সূচিত হয়েছিল তা তুর্কিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল।" ভারতবর্ষে তুর্কি বীর সুলতান মাহমুদের বার বার অভিযান এ উপমহাদেশের ইতিহাসকে রোমাঞ্চকর করে রেখেছে।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

গজনি বংশ: গজনি বর্তমান আফগানিস্তানের একটি শহরের নাম। এটি কাবুল এবং কান্দাহারের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।' আব্বাসি রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে যেসব রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে সামানিদ বংশ অন্যতম। সামানীয় বংশের একজন দাস ছিলেন আলপ্তগিন। আলপ্তগিন সামানিদ শাসনকর্তা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে আগমন করেন এবং গজনিতে ৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্বাধীন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি সামানিদদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেই শাসন পরিচালনা করেন। তার মৃত্যুর পর ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগিন গজনির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নিজ রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। আর তার প্রতিষ্ঠিত - রাজবংশটিই ইসলামের ইতিহাসে 'গজনি রাজবংশ' নামে পরিচিত। গজনি রাজবংশ ৯৭৭ থেকে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকাজ পরিচালনা করে।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

আলন্তগিন : আলপ্তগিন ছিলেন সামানিদ বংশের পঞ্চম রাজা আব্দুল মালিকের ক্রীতদাস। প্রভুর প্রতি আনুগত্য এবং কর্মগুণের দ্বারা একসময় তিনি খোরাসানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। আলপ্তগিন ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও চরিত্রবান। তার প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি গজনিতে উপস্থিত হন এবং সেখানকার শাসনকর্তা আবু বকর লাইককে পদচ্যুত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। মূলত এ সময় হতেই গজনি বংশের শাসনকালের সূচনা হয়।

সবুক্তগিন: স্বাধীন গজনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সবুক্তগিন। সবুক্তগিন ছিলেন আলপ্তগিনের ক্রীতদাস ও জামাতা। শৈশবেই ক্রীতদাসরূপে আলপ্তগিন তাকে ক্রয় করেছিলেন। সবুক্তগিনের কর্মদক্ষতা ও প্রভুভক্তি আলপ্তগিনকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি সবুক্তগিনকে 'আমিরুল ওমরাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং নিজের কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেন। সবুক্তগিন ছিলেন প্রতিভাবান ও অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি নামেমাত্র সামানিদ শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। মূলত গজনি রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধিই ছিল তার স্বপ্ন। সুলতান মাহমুদ ছিলেন সবুক্তগিনের সুযোগ্য পুত্র।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহন

গজনির সুলতান মাহমুদ

সুলতান মাহমুদ ৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে অনেকে তাকে 'মাহমুদ জাবুলি' নামেও ডাকা হতো।' ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে এটি নিশ্চিত, সবুক্তগিন তাকে প্রশাসন ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে যেমন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তেমনি রাজনীতিবিদ্যার কলাকৌশল সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সুলতান মাহমুদ অসি পরিচালনায়ও পারদর্শী ছিলেন। ভাইকে সরিয়ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিদ্যোৎসাহী, প্রজারঞ্জক, সুশাসক এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুলতান মাহমুদ গজনি সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠই ছিলেন না, বরং সমসাময়িক নৃপতিদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ২৬ বছর বয়সে ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা লাভ করে তিনি সামানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের সামানীয়দের পরাজিত করে স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর মাহমুদ 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করে তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা কাদির বিল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে পত্র প্রেরণ করেন। আব্বাসি খলিফা কাদির বিল্লাহ তাকে 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' উপাধি দেন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহন

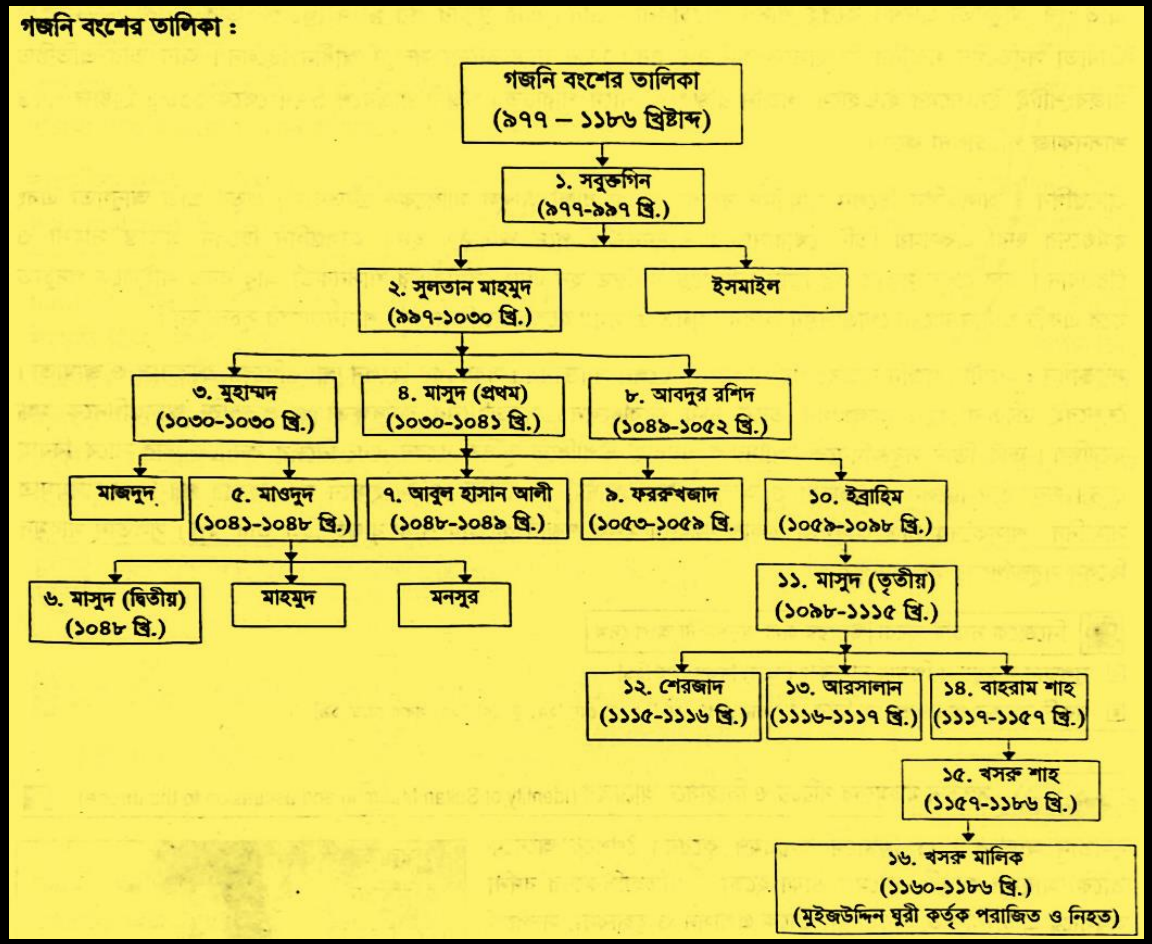

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য

সুলতান মাহমুদ একজন উচ্চাভিলাষী, যুদ্ধপ্রিয় ও অপরাজেয় বীর ছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ভারতে ১২ বার সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। Vincient A. Smith ১৫ বা ১৭ বার অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। ভি. ডি. মহাজন বলেন, "It appears that the number 17 is more correct." অর্থাৎ, ১৭ সংখ্যাটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। সুলতান মাহমুদ প্রত্যেক সামরিক অভিযানে বিজয়ী হন; কিন্তু পাঞ্জাব ছাড়া অন্য কোনো এলাকা তিনি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। যদি সাম্রাজ্যভুক্ত না-ই করে থাকেন তাহলে সামরিক অভিযান প্রেরণের উদ্দেশ্য কী ছিল? এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আমরা সেসব মত থেকে প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারি।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য

ধর্মীয় উদ্দেশ্য: ধর্ম প্রত্যেকটি মানুষের কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। সুলতান মাহমুদ যতবার ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন, তার পিছনে কতটুকু ধর্মীয় উদ্দেশ্য কাজ করেছে তা বলা খুব মুশকিল। ধর্মের প্রতি দুর্বলতা থাকার কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয়করণ করা খুব সহজ। সুলতান মাহমুদও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে সামরিক অভিযানকে ধর্মীয় আচরণ দিয়ে থাকতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ঐতিহাসিক উত্তী ছিলেন সুলতান মাহমুদের সভাসদ। তার মতে, ভারতকে ইসলামি দেশে পরিণত করার জন্যই সুলতান মাহমুদ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, আজন্ম গুণাবলির সাথে তার সীমাহীন ধর্মীয় প্রবণতার মিশ্রণ ঘটে এবং এটি তাকে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতার সম্মানে ভূষিত করে। অন্যত্র তিনি আরও বলেন, তিনি বার বার হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। ভি. ডি. মহাজনের মতে, যখন বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ তাকে (মাহমুদকে) একজন সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তাকে ইয়ামিন উদদৌলা ও আমিন উল মিল্লাত উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তখন তিনি (খলিফা) তাঁকে প্রতিবছর ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণের আদেশ দিয়েছিলেন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য: কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, মধ্য এশিয়ায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের রাজা জয়পাল ও তাঁর বংশীয় রাজন্যবর্গের শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভারত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোও গজনি রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এ হুমকির কারণেই সুলতান মাহমুদ ২৭ বছরের ১৭ বার ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তবে তিনি পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনো এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। কারণ সেসময় মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষব্যাপী এত বিশাল একটি সাম্রাজ্য শক্তভাবে শাসন করা সম্ভবপর ছিল না। সুলতান মাহমুদ পশ্চিমাঞ্চলে দেশজয় এবং শক্তি সংগঠনের নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে পাঞ্জাব, মুলতান প্রভৃতি কয়েকটি স্থান নিজের রাজ্যভুক্ত করে সন্তুষ্ট ছিলেন। এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এলাকাগুলো সুলতান মাহমুদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উৎস ছিল। স্বীয় সাম্রাজ্যের স্বার্থে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দখল করেছিলেন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য: অধ্যাপক হাবিব, ভিনসেন্ট স্মিথ, ও এস.এম. জাফরসহ অনেক ঐতিহাসিকের মতে, সুলতান মাহমুদ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কারণ সে যুগে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, সাম্রাজ্যে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, বিশাল সেনাবাহিনীকে বেতন-ভাতাদি দেওয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর অর্থ দরকার ছিল। ভারত ছিল অফুরন্ত ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। অথচ এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য সুলতান মাহমুদ অর্থনৈতিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য পূর্বমুখী নীতি গ্রহণ করেন।

নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের পিছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল। অধ্যাপক এম হাবিব, এস এম জাফর, ভি এ স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের জন্য দায়ী করেছেন। অধ্যাপক এম হাবিব ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাথে সুলতান মাহমুদের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ নয় বরং গৌরব ও স্বর্ণের লোভে পরিচালিত পার্থিব যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। 'An Advanced History of India' গ্রন্থেও 'ভারতীয় ধনৈশ্বর্য, সংগ্রহ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ

১. সীমান্ত দুর্গ ও শহর বিজয়: লামঘাম (জালালাবাদ) ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী খাইবার গিরিপথের সীমান্তবর্তী শহরগুলো সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে দখল করেন। এতে তাঁর রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত হয়।

২. জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান: যুদ্ধের স্থান ও তারিখ- পেশোয়ার, ২৭ নভেম্বর ১০০১ খ্রিষ্টাব্দ। সুলতানের সৈন্য-১০ হাজার অশ্বারোহী। জয়পালের সৈন্য- ১২ হাজার অশ্বারোহী, ৩০ হাজার পদাতিক এবং তিনশত হস্তীবাহী।

নেতৃত্ব- সুলতান মাহমুদ ও জয়পাল নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

ফলাফল- জয়পাল সপরিবারে বন্দি হন। ভি. ডি. মহাজন-এর মতে, "১৫ হাজার হিন্দু এ যুদ্ধে নিহত হয়। জয়পাল পুত্র আনন্দ পালের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে নিজে আগুনে আত্মাহুতি দেন।"

আত্মাহুতি দেওয়ার আগে ২১/২ লক্ষ দিনার এবং ৫০টি হাতির বিনিময়ে জয়পাল সপরিবারে মুক্তিলাভ করে। সুলতান মাহমুদ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী শহর উন্দ (Und) দখল করে গজনিতে ফিরে আসেন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ

৩. ভিরা বিজয়: সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে ১০০৪-১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ভিরার (ভাটিয়া) আছে রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধ ময়দান হতে ভিরার রাজা বিজয় রায় পলায়ন করেন। মুসলমান সৈন্যরা তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। উপায়ন্তর না দেখে বিজয় রায় ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন।

৪. মুলতান বিজয়: সুলতান মাহমুদ তাঁর চতুর্থ অভিযান পরিচালনা করেন মুলতানের মুসলিম শাসক কারামাতীয় গোষ্ঠীর নেতা শেখ হামিদ লোদীর পৌত্র আবুল ফাতাহ দাউদ-এর বিরুদ্ধে। সুলতান মাহমুদ দাউদকে কাফেরের সাথে তুলনা করতেন। ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে মুলতানের দিকে সামরিক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে দাউদের মিত্র পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আনন্দ পাল সুলতান মাহমুদকে সশস্ত্র বাধা দেন। মাহমুদ যুদ্ধে আনন্দ পালকে পরাজিত করেন। ফলে আনন্দ পাল কাশ্মীরের দিকে পলায়ন করেন। জয়পালের আক্রমণ অতিক্রম করে সুলতান মাহমুদ মুলতানে উপনীত হন। দাউদের সাথে সাত দিন ধরে মাহমুদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হন এবং বার্ষিক কর প্রদানে সম্মত হন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ জয়পালের পুত্র সুখপাল (মুসলিম নাম নওশাহ) এর ওপর মুলতান এবং পাঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করে গজনিতে ফিরে যান।”

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ

৫. সুখপালের বিরুদ্ধে অভিযান: সুখপাল রাজনৈতিক প্রতিকূলতায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুলতান মাহমুদ গজনিতে ফিরে গেলে নিজেকে বিপদমুক্ত ভেবে নওশাহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন এবং পূর্ব নাম সুখপাল ধারণ করেন। ১০০৭খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ সুখপালের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। সুখপাল বন্দি হয়। তার নিকট থেকে ৪০ হাজার দিরহাম শাস্তিস্বরূপ আদায় করা হয়।

৬.আনন্দপালের বিরুদ্ধে অভিযান: সুলতান মাহমুদের ষষ্ঠ অভিযান নানা কারণে ভারতবর্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ অভিযান ছিল রাজা আনন্দপালের বিরুদ্ধে।

যুদ্ধের স্থান ও সময়: যুদ্ধের স্থান পেশোয়ার, সময় ১০০৮ খ্রি. পেশোয়ার ও ওয়াইহিন্দের মধ্যবর্তী উন্দ। ১০০৮-১০০৯ খ্রি.।

আনন্দপালের সৈন্য: আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লি এবং আজমীরের রাজাদের নিয়ে একটি কনফেডারেন্সি গড়ে তোলেন। ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) দুর্ধর্ষ, সাহসী, খোক্কার সৈন্য আনন্দপালের পক্ষে যোগ দেয়। দূরতম প্রদেশ হতে মহিলারা তাদের স্বর্ণ বিক্রয় করে অর্থ দান করেন। এককথায়, আনন্দপাল একটি বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে এবং জনসাধারণের সহানুভূতি আদায় করতে সক্ষম হন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ

৭. নগরকোট বিজয়: ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে সপ্তম অভিযানে সুলতান মাহমুদ কাংরা (Kangra) পাহাড়ের নগরকোট দুর্গ দখল করেন। সুলতানের বাহিনী আসতে দেখে দুর্গের রক্ষকবাহিনী ফটক খুলে দেয়। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, ৭ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (দিনার), ৭০০ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত তৈজসপত্র, ২০০ মণ খাঁটি সোনা, ২০০০ মণ অপরিশোধিত রৌপ্য এবং ২০ মণ বিভিন্ন ধরনের মণি-মুক্তা সুলতান মাহমুদের হস্তগত হয়। ভি. ডি. মহাজন ঐতিহাসিক ফিরিশতার এ বিবরণ তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।
৮.ফতেহ দাউদের বিদ্রোহ দমন: ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মুলতানের বিদ্রোহী ফতেহ দাউদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে বন্দি করেন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ

৯. ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে অভিযান: আনন্দ পাল রাজধানী নন্দনাতে স্থানান্তর করেন। তিনি লবণগিরি অঞ্চলে একটি সামরিক ছাউনি এবং সৈন্যদল গঠন করেন। সেখানেই আনন্দপাল স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ত্রিলোচন পাল। ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। অল্পকাল পরেই নন্দনা অধিকৃত হয়। ত্রিলোচন পাল পালিয়ে কাশ্মীররাজ তুঙ্গর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান মাহমুদ কাশ্মীরের ত্রিলোচন পাল এবং কাশ্মীররাজ তুঙ্গরকে সম্মিলিতভাবে পরাজিত করেন। ত্রিলোচন পাল কাশ্মীরে রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন এবং পিতৃরাজ্যের শিবলি পাহাড়ে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলরাজের সাথে তার একটি চুক্তিও হয়। সুলতান মাহমুদ তাদের দুজনের জোট ভেঙে দেওয়ার জন্য রামগঙ্গার নিকটে ত্রিলোচন পালকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাবকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং এ প্রদেশের শাসনভার একজন আমিরের ওপর ন্যস্ত করেন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ

১০. চান্দেলা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান: কনৌজের প্রতিহাররাজ রাজ্যপাল বিনাযুদ্ধে সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করায় কালিঞ্জরের চান্দেলরাজ গোন্ডা এবং গোয়ালিয়রের রাজপুত রাজা একসাথে কনৌজ আক্রমণ করেন এবং রাজ্যপালকে পরাজিত ও নিহত করেন। অনুগত রাজ্যপালের নিহত হওয়ার সংবাদে মাহমুদ ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং চান্দেলরাজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। চান্দেলরাজ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং মাহমুদ বিজয়ী বেশে চান্দেলরাজের রাজধানীতে প্রবেশ করেন।

১১. গোয়ালিয়র বিজয়: ১০২১-২২ খ্রিষ্টাব্দে চান্দেলরাজ্যের অপর মিত্র এবং কনৌজের প্রতিহাররাজ রাজ্যপালের হত্যাকারী গোয়ালিয়র রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। গোয়ালিয়র রাজা বার্ষিক কর প্রদানে রাজি হয় এবং সুলতান মাহমুদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

১২. কালিঞ্জর বিজয়: ১০২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কালিঞ্জর রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কালিঞ্জর রাজা বিনা যুদ্ধে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং বার্ষিক কর প্রদানে রাজি হন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ

সমরকুশলতা ও সামরিক মেধায় অভিজ্ঞ সে যুগে সুলতান মাহমুদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। প্রত্যেক শাসককে সে যুগে একজন ভালো যোদ্ধা ও সমরকুশলী হতে হতো। কিন্তু ভারতীয় শাসকেরা শক্তিশালী শাসক ও যোদ্ধা ছিলেন না। সুলতান মাহমুদ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করে প্রতিবারেই সাফল্যের গৌরব অর্জন করেন। এসব সাফল্যের মূলে বেশকিছু কারণ বিদ্যমান ছিল। যেমন-

প্রথমত, সুলতান মাহমুদ নিজ প্রচেষ্টায় একটি সুসংঘবদ্ধ সামরিক বাহিনী গঠন করেন। তাঁর বাহিনীতে আফগান, তুর্কি, ভারতীয় এবং পারস্যবাসী থাকলেও শৃঙ্খলা ও কঠোর অনুশীলনীর দ্বারা একটি সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও অনৈক্য এবং অরাজকতা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হ্রাস করে। ফলে সুলতান মাহমুদের সহজেই বিজয় অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়।

তৃতীয়ত, হিন্দুরা বর্ণবাদ ও ধর্মীয় কুসংস্কারে এতই কলুষিত ছিল যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক কোন্দল ও বৈরী মনোভাব চরম আকার ধারণ করেছিল। ফলশ্রুতিতে ভারতীয় শক্তি অধঃপতনে নিপতিত হয়। আল বেরুনির ভাষায়, "একাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ রাজনৈতিক অনৈক্য, সামরিক শক্তিহীনতা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারে কলুষিত ছিল।" ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ এটিকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সাথে তুলনা করেন।

সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ

চতুর্থত, যুদ্ধরীতি পদ্ধতি ও কৌশলে তুর্কিবাহিনী হিন্দুবাহিনী অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ছিল। তাছাড়া সুলতান মাহমুদের অশ্ববাহিনীর উন্নত রণকৌশল ও ক্ষিপ্রতার সম্মুখীন ভারতীয় হস্তিবাহিনী সহজেই পরাভূত হয়েছে।

পঞ্চমত, সুলতান মাহমুদের সৈন্যদের মধ্যে ধর্মীয় পুণ্য লাভ ও গণিমতের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভঅর্জনে মনোবল সুদৃঢ় করে তোলে।

ষষ্ঠত, সুলতান মাহমুদ একজন অসাধারণ সমরকুশলী অধিনায়ক ছিলেন। তিনি প্রতিটি অভিযানেই অংশগ্রহণ করতেন। ফলে সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হতো। হাবিবের ভাষায়, "সুলতানের অসামান্য মেধা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফলে এটি (সামরিক বাহিনী) দ্বিধাবিভক্ত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাজেয় এবং দুর্ভেদ্য শক্তিতে পরিণত হয়।"

পরিশেষে বলা যায়, সুলতান মাহমুদের সৈন্যবাহিনী পারসিক, আফগান, তুর্কি ও ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হলেও তাঁর সেনাবাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁদের ক্ষিপ্রতা ও সামরিক দক্ষতার কাছে ভারতীয় বাহিনী পরাজিত হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিল অনৈক্য, অসাম্য, অরাজকতা, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত। ভারতীয়রা জাতিতে জাতিতে ও গোত্রে গোত্রে বিভক্ত থাকার কারণে সম্মিলিতভাবে সুলতান মাহমুদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেনি। এছাড়া ভারতীয়দের চেয়ে সুলতান মাহমুদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল উন্নত। এসব কারণে সুলতান মাহমুদ বিজয়ী হন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলাফল

রাজনৈতিক ফলাফল: সুলতান মাহমুদের পূর্বমুখী নীতি গ্রহণের ফলে তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমানা সুরক্ষিত হয়। এছাড়া আঘাত পাওয়ার আগেই আঘাত করার নীতি গ্রহণের ফলে ভারত থেকে আক্রমণের ক্ষীণ সম্ভাবনাও চিরতরে বিনষ্ট হয়। ২ ডিসেম্বর, ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কনৌজের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বিনাযুদ্ধে জয়ী হন। রাজ্যপাল সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করায় কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়রের রাজা একসাথে কনৌজ আক্রমণ করেন। ভারতে যেন কোনো জোট তৈরি না হয় এ লক্ষ্যে তিনি পৃথকভাবে কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। বার বার সামরিক অভিযানের ফলে ভারতে সুলতান মাহমুদের কেউ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সাহস পায়নি। গজনি বংশের পাঞ্জাব অধিকার ছিল ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠিস্বরূপ।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলাফল

হিন্দু সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ: সুলতান মাহমুদ রণনিপুণ, দুর্ধর্ষ কৌশলী যোদ্ধা, সেনাপতি ও চৌকশ নেতা ছিলেন। হিন্দু রাজন্যবর্গ এককভাবে এবং জোটগতভাবে সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করতে পারেনি। এতে হিন্দুদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। হিন্দুরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে হেরে গিয়ে হিন্দুদের মনে তুর্কি ভীতি জেগে ওঠে। এ তুর্কি ভীতির সুবিধা লাভ করে পরবর্তী মুসলিম আক্রমণকারিগণ। অর্থাৎ ঘুরী বংশ তুর্কি ভীতির পুরাপুরি সুবিধা লাভ করে।

অর্থনৈতিক ফলাফল: যুগ যুগ ধরে ভারতীয়রা যেসব ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল, সেগুলো সুলতান মাহমুদ গজনিতে নিয়ে যান। তিনি ভারতের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ দিয়ে গজনির শহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। গজনিকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করার পিছনে ভারতের ধনসম্পদ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জনকল্যাণেও ভারতীয় সম্পদ ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, বার বার অভিযানের ফলে ভারতের বহু মন্দির ও শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের যে ধর্মীয় আবেগ জড়িত ছিল তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সুলতান মাহমুদের যুদ্ধলব্ধ অর্থসম্পদে গজনির অর্থনৈতিক অবস্থা ফুলেফেঁপে উঠলেও ভারতের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। কারণ মন্দিরগুলোতে অনেক বিত্তবানের ব্যক্তিগত ধনসম্পদ গচ্ছিত ছিল। মন্দিরের ধনসম্পদসহ ব্যক্তিগত ধনসম্পদও সুলতান মাহমুদের হস্তগত হয়। ফলে ভারতের অর্থ ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলাফল

ধর্মীয় ফলাফল: সুলতান মাহমুদের সময়ে বহু পির-দরবেশ, ওলি ইসলাম প্রচারকে নিজের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতেন। এজন্য তারা অমুসলিম দেশে গমন করতেন এবং ইসলাম প্রচার করতেন। ভারতে সুলতান মাহমুদের আগমনের সময় সেনাবাহিনীর সাথে এবং বিচ্ছিন্নভাবে অনেক পির-দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। ফলে ভারতে ইসলামের পরিচিতি এবং মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উইলসন হেক বলেন, "He was the first to carry the banner of Islam into the heart of India." অর্থাৎ মাহমুদই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে যান।

সাংস্কৃতিক ফলাফল: সুলতান মাহমুদের সামরিক অভিযানের ফলে মুসলমানগণ ভারতীয় তথা হিন্দুদের সংস্পর্শে আসে। ১০০০-১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে তুর্কি, পারস্য, আফগান সৈন্যদের সাথে ভারতীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটে। এর ফলে দুটি ধর্মের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং উভয়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু আত্তীকৃত হয়। সুলতান মাহমুদও এ বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে ইন্দো-মুসলিম কৃষ্টি জন্মলাভ করে।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদ একজন ধর্মনিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যপরায়ণ, পরধর্মসহিষ্ণু সুলতান ছিলেন। তার কৃতিত্ব ছিল বহুমাত্রিক। ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে তিনি গজনিতে মৃত্যুবরণ করেন। অসাধারণ কৃতিত্ব, অনন্য চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য ঐতিহাসিক গিবন তাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি শুধু একজন সামরিক প্রতিভাধর সেনাপতিই ছিলেন না বরং একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর, দক্ষ প্রশাসক, সমরনায়ক, উদার ও বিদ্যোৎসাহী। নিচে সামগ্রিক তার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা হলো-

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা: সুলতান মাহমুদ পৈত্রিকসূত্রে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য লাভ করেন। তিনি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় রাজ্যবিস্তার করেন। পূর্বে পাঞ্জাবকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এতে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা দাঁড়ায় পশ্চিমে হামাদান শহর হতে পূর্বে ভাতিন্দা এবং বলখ ও মার্ভ হতে সিজিস্তান পর্যন্ত। একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যকে শুধু বাহুবলে একটি বিশাল ও সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করা কম কৃতিত্বপূর্ণ কাজ নয়।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব

সফল সমরনেতা: একজন সেনাপতির সামরিক মেধা, কূটকৌশল, দূরদর্শিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণ ও উত্তেজিত করার ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। যুদ্ধের ময়দানে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিতেন। এতে সৈনিকরা দ্বিগুণ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তিনি প্রত্যেকটি সামরিক অভিযানের পূর্বে উত্তমরূপে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। সুলতান মাহমুদ সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন। তাঁর দেহে ও মনে ছিল শক্তি ও সাহস।

সাংগঠনিক দক্ষতা: সুলতানের বাহিনীতে আফগান, তুর্কি, আরব, পার্সিয়ানসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সৈন্য ছিল। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব হলো তিনি সকল সৈন্যকে একটি জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। প্রত্যেক সৈন্যই তার নিকট সমান অনুগত ছিল। সৈন্যদের মাঝে দলগত কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব

দূরদর্শিতা ও নির্ভীকতা: ঐতিহাসিক ড. হাবিব বলেন, "Strategy rather than tactics was Mahmud's strong point." অর্থাৎ, যুদ্ধকৌশল অপেক্ষা যুদ্ধ পরিকল্পনাকে সুলতান মাহমুদ অধিক গুরুত্ব দিতেন। ভারতের শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে তিনি যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারতে তিনি কোনো মিত্রজোট তৈরি হওয়ার সুযোগ দেননি। এজন্য তিনি কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব

প্রজাবান্ধব শাসক : প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, সুলতান মাহমুদের সময় গজনি রাজ্য সমৃদ্ধি ও গৌরবের স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছিল। তার রাজ্যে সচ্ছলতা ছিল। সুগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং প্রজাবান্ধব সরকার ব্যতীত এরূপ উন্নতি করা সম্ভব 'নয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আস্থা অর্জন করেন। সুলতান মাহমুদের প্রশাসনের বিপক্ষে কোনো গণবিক্ষোভ দেখা যায়নি।

ন্যায়বিচারক: সুলতান মাহমুদের রাজ্যে আইনের শাসন বলবৎ ছিল। আইনের চোখে সবাই সমান এমন নীতি তিনি গ্রহণ করেন। এতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি তিনি কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে জানা যায়।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব: সুলতান মাহমুদ শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা হলেও তার ভেতর সুকুমার বৃত্তিগুলো জাগ্রত ছিল। কালোত্তীর্ণ, স্বনামধন্য ও মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক এবং কুরআন ও হাদিসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তার রাজসভা ও রাজ্যের ভূষণস্বরূপ। প্রাচ্যের হোমার নামে খ্যাত মহাকবি ফেরদৌসির মহাকাব্য 'শাহনামা' কালোত্তীর্ণ একটি গ্রন্থ। সুলতান মাহমুদের রাজসভার নক্ষত্র আল বেরুনি ভারতের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থ অনুবাদ করে গজনিতে নিয়ে যান। সুলতান মাহমুদ গজনিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি জাদুঘর স্থাপন করেন। সুলতান মাহমুদ শিল্পী এবং স্থপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। গজনিতে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ গজনিতে নির্মিত হয়েছিল। এখানে একটি বড় মসজিদ ছিল যার চারপাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক থাকার ব্যবস্থা ছিল। গজনি মধ্য এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নগরীতে পরিণত হয়েছিল। সামান্য সৈনিক থেকে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া এবং ভারতে ভবিষ্যৎ মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করা ছিল সুলতান মাহমুদের অন্যতম কৃতিত্ব।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শিল্পকলা এবং জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ইতিহাসে স্থায়ী আসন তৈরি করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, সুলতান মাহমুদ নিজেও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। 'তাফরিদুল ফুরু' নামক ফিকাহশাস্ত্রের গ্রন্থটি তার রচিত বলেও কথিত আছে। সুলতান মাহমুদ শিল্পকর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তার দরবারে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন গণিতবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ এবং সংস্কৃত পণ্ডিত আল বেরুনি, ইতিহাসবিদ উৎবি, দার্শনিক আল ফারাবি এবং 'তারিখ-ই-সবুক্তগিন' গ্রন্থপ্রণেতা বায়হাকি, যাকে এস লেনপুল 'প্রাচ্যের পেপিস' (Oriental Pepys) নামে অভিহিত করেছেন। আল বেরুনি ছিলেন সুলতান মাহমুদের দরবারের প্রধান পণ্ডিত। তিনি মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। আল বেরুনি বহু শাস্ত্রবিদ। তিনি 'আসার আল বাকিয়া' 'তাহফিম' এবং 'কানুন-ই-মাসুদি' সহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তবে যে গ্রন্থটি আল বেরুনিকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে তা হলো 'কিতাব-উল-হিন্দ'। এ গ্রন্থটি ভারতের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় জীবনধারার এক মহামূল্যবান দলিল হিসেবে পণ্ডিত মহলে সমাদৃত হয়েছে।ция в по

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মাহমুদের চরিত্র

মধ্যমাকৃতির এবং শক্তিশালী ও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন সুলতান মাহমুদ। রাজকীয় সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উঁচুদরের সামরিক নেতা। ব্যক্তিজীবনে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অনুশাসনগুলো মেনে চলতেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা তিনি ধৈর্য ধরে শুনতেন। তিনি ঘুষ খেয়ে ন্যায়বিচারের রায়কে উল্টে দিতেন না। তিনি ছিলেন ভীষণ অধ্যবসায়ী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি কখনো কাজ ফেলে রাখতেন না। যা করা দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা তিনি মন দিয়ে করতেন। তিনি প্রত্যেক সামরিক অভিযানে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ও কৌশলী। জীবনে উন্নতি করার জন্য তিনি পরিকল্পনাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

গজনি বংশের পতনের কারণ

গজনির সুলতান মাহমুদ যে বিশাল সাম্রাজ্য স্বীয় শৌর্যবীর্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন, তা তার মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। গজনি সাম্রাজ্য পতনের মূলে বিভিন্ন কারণ ছিল বিদ্যমান ছিল। যেমন-

প্রথমত, সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর দুর্বল, বিলাসপ্রিয় ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের কুশাসন গজনি সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে।

দ্বিতীয়ত, সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য মূলত সামরিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সামরিক ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং এর ফলে সেলজুক তুর্কিদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে।

তৃতীয়ত, সুলতান মাহমুদ একজন অসাধারণ রণকুশলী ও সমরনেতা ছিলেন। কিন্তু বিজিত অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বীয় প্রভুত্ব কায়েম করতে ব্যর্থ হন। ভিনসেন্ট স্মিথের ভাষায়, "He did not attempt to effect any permanent conquest except in the Punjab." রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাবে ভারতবর্ষে তার বিজয় নিষ্ফল ছিল।

গজনির সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

গজনি বংশের পতনের কারণ

চতুর্থত, সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে অভিযান করে যে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ আহরণ করেন, তা তাঁর উত্তরাধিকারিগণ ভোগবিলাসিতায় ব্যয় করে সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

পঞ্চমত, সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত, বিদ্রোহ, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের ফলে গজনি সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 'গজনি সাম্রাজ্য ছিল নানা জাতির সমষ্টি। এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কেবল সুযোগ্য সুলতানের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর দক্ষ, সাহসী ও দূরদর্শী উত্তরাধিকারীর অভাবে গজনি বংশের পতন ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

টপিক – ০৪ মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

টপিক ০৪: মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর পরিচয়

গজনি ও হিরাতের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম ঘুর (ঘোর নয়)। এ জায়গার নামানুসারে হয়েছে ঘুরী বংশ। ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দে গুজ তুর্কিগণ গজনির সুলতান খসরু শাহকে গজনি হতে বিতাড়িত করেন। খসরু শাহ বাধ্য হয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় নেয়। ফলে পাঞ্জাব ছাড়া গজনির অন্যান্য অঞ্চল গুজ তুর্কিদের হস্তগত হয়। খসরু শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র খসরু মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময়ে ঘুরী শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘুরী রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিন হুসাইনের (জাহানসুজ খেতাবপ্রাপ্ত) মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন শাসনভার গ্রহণ করেন। ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঘুজ তুর্কিদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে গজনি দখল করেন। গিয়াসউদ্দিন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ বিন সামকে গজনির শাসনভার অর্পণ করেন

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর পরিচয়

মুহাম্মদ বিন সাম বাল্যকালে' শিহাব উদ্দিন (ধর্মের অগ্নিশিখা) নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় মুহাম্মদ-বিন-সাম 'শিহাব উদ্দিন'-এর পরিবর্তে মুইজউদ্দিন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম কিংবা মুহাম্মদ ঘুরী নামে ইতিহাসে অধিক পরিচিত। মুদ্রায় তিনি মুহাম্মদ বিন, সাম-এর পুত্র খোদিত করতেন। মুহাম্মদ ঘুরীর সময় হতে ভারতে মুসলমানদের তৃতীয় পর্যায়ের অভিযান শুরু হয় এবং তিনি গজনি হতে ভারতে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময়ে ভারতের অবস্থা

মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময় ভারতের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অরাজকতাপূর্ণ। গোটা দেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এসব রাজ্যের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথার অভিশাপে সামাজিক ঐক্য ছিল না বললেই চলে। ব্রাহ্মণ শ্রেণির সাথে নিম্নবর্ণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এজন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ তথা শাসকগোষ্ঠীকে চরম ঘৃণা করত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণির অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অতিষ্ঠ ছিল। এজন্য নির্যাতিত ও নিপীড়িতরা মুক্তির পথ খুঁজত। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অর্থনৈতিকভাবেও শোষিত হতো। তাদের সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি করতে হতো কিন্তু ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা তারা পেত না। যেকোনো পণ্য বা শস্য উৎপাদনে তাদের স্বাধীনতাও ছিল না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে ইচ্ছামতো পণ্য কিনতে পারত না। ফলে এসময়ে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ ছিল। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময়ে ভারতের অবস্থা

পাঞ্জাব : একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পাঞ্জাব গজনি রাজ্যভুক্ত হয়। মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণকালে পাঞ্জাব গজনি বংশের খসরু মালিকের শাসনাধীনে ছিল। বিলাসপ্রিয় ও অযোগ্য খসরু মালিককে যুদ্ধে পরাজিত করে মুহাম্মদ ঘুরী পাঞ্জাব দখল করেন।

মুলতান: সুলতান মাহমুদ ফতেহ দাউদকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুলতান অধিকার করেন। তবে সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর কারামতিগণ পুনরায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

সিন্ধু: সিন্ধুতেও সুলতান মাহমুদ আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সুমরা নামক স্থানীয় একটি গোত্রের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। কারামতিদের ন্যায় সুমরারাও শিয়া মুসলমান ছিল।

দিল্লি ও আজমির: মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে দিল্লি ও আজমির ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। রাজপুত্র চৌহান বংশ শাসিত এ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা ছিলেন পৃথ্বিরাজ। তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ জয় করে স্বীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন এবং মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজপুত্র রাজাদের নিয়ে একটি মিত্রসংঘ গঠন করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময়ে ভারতের অবস্থা

কনৌজ : কনৌজ ছিল ভারতের একটি অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য। এ রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন জয়চাঁদ। পৃথ্বিরাজ জয়চাঁদের কন্যাকে অপহরণ করায় দুই রাজ্যের মধ্যে চরম শত্রুতা শুরু হয়। ফলে মুহাম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে জয়চাঁদ পৃথ্বিরাজের বিপক্ষে অবস্থান নেন।

গুজরাট: গুজরাটের চালুক্য বংশ ছিল পশ্চিম ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজপুত রাজ্য। আনহিলওয়ারা ছিল গুজরাটের রাজধানী। মুহাম্মদ ঘুরী যখন ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন ভীমদেব গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন।

বুন্দেলখণ্ড: মুহাম্মদ ঘুরী আক্রমণকালে চান্দেলা বংশ বুন্দেলখণ্ড রাজ্য শাসন করত। চান্দেলা বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন পারমারদী দেব। তিনি চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজের কাছে যুদ্ধে হেরে গেলে তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ পৃথ্বিরাজকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ফলে মুহাম্মদ ঘুরীর আক্রমণকালে তিনি পৃথ্বিরাজকে কোনো সাহায্য করেননি।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

ঘুরীর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য

উচ্চাকাঙ্ক্ষা: মুহাম্মদ বিন সাম সংক্ষেপে মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্যমী, কষ্টসহিষ্ণু, দক্ষ সংগঠক। তিনি ঘুর রাজ্যের সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন। মধ্য এশিয়ার খোরাসানে মুহাম্মদ ঘুরী বেশ কয়েকবার আক্রমণ পরিচালনা করেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি ব্যর্থ হন। স্বাভাবিকভাবেই তার দৃষ্টি নিবন্ধ হয় ভারতবর্ষের দিকে।

নিরাপত্তা প্রদান: গজনি ও খোরাসান সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী হিসেবে ঘুর রাজ্যের সৃষ্টি, পরস্পরিক সমঝোতার ফলে নয়। গজনি ও খোরাসান সাম্রাজ্য ঘুর রাজ্যের বিকাশকে স্বাভাবিকভাবে নিবে না, এটি মুহাম্মদ ঘুরীর নিশ্চয়ই জানা ছিল। এজন্য তিনি শুরুতেই আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য: মুসলমানগণ ইতিহাস সচেতন জাতি। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান এবং সর্বোপরি সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাবে মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের ইতিহাস একজন মুসলিম হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর জানা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষের ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কথাও তাঁর জানা ছিল। এগুলো থেকেও তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের অনুপ্রেরণা পান।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

ঘুরীর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য

হিন্দুদের রাজনৈতিক অনৈক্য ও সামরিক দুর্বলতা: তৎকালীন ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। তারা একে অপরের সাথে কলহ-বিবাদে লিপ্ত ছিল। বিদেশি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজন্যবর্গের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। এছাড়া তৎকালীন ভারতবর্ষের সামরিক দুর্বলতা মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য: বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ ঘুরী একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তাঁর উপাধি মুইজউদ্দিন এবং শিহাব উদ্দিন থেকেও তাঁর ধার্মিকতা সম্পর্কে জানা যায়। শিহাব উদ্দিনের অর্থ ধর্মের অগ্নিশিখা।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

মুলতান ও সিন্ধু দখল: কারামাতীয়গণ মুলতান শাসন করত। কারামাতীয়রা ছিল মুসলমানদের শিয়া-সুন্নি শাখার মতো ইসমাইলীয় সম্প্রদায়ের একটি শাখার নাম। ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে" বা ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী কারামাতীয় শাসককে পরাজিত করে মুলতান দখল করেন। তিনি নিজের মনোনীত একজনকে মুলতানের শাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। তৎকালীন সিন্ধু দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। আপার সিন্ধু (Upper Sindh) ও লোয়ার সিন্ধু (Lower Sindh)। আপার সিন্ধুর উচের রাজপুত রাজা ভাটির সাথে রানির সম্পর্ক ভালো ছিল না। প্রচলিত কাহিনি মতে, ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ রানির সাথে আঁতাত করে মুহাম্মদ ঘুরী রাজা ভাটিকে হত্যা করেন। ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লোয়ার সিন্ধু (Lower Sindh) দখল করেন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

পাঞ্জাব দখল: পাঞ্জাব ছিল তৎকালীন ভারতের প্রবেশদ্বার। গজনির রাজাগণ গজনি হতে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্জাব শাসন করতেন। ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী পাঞ্জাবের শাসনাধীন পেশোয়ার দখল করেন। ১১৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খসরু মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ এবং লুটতরাজ করেন। এ অভিযানে তিনি শিয়ালকোট দখল করেন।

১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জম্মুর রাজা চক্রদেবের সহায়তায় মুহাম্মদ ঘুরী খসরু মালিককে গ্রেপ্তার করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বন্দি অবস্থায় খসরু মালিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে গজনি বা ইয়ামেনি বংশের শাসন সমাপ্ত হয়।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

তরাইনের ১ম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ): তরাইন একটি গ্রামের নাম। এটি থানেশ্বর হতে ১৪ মাইল বা ২২.৫৩ কি. মি. দূরে অবস্থিত। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে এখানে মুহাম্মদ ঘুরীর সাথে পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে গঠিত জোট বাহিনীর যুদ্ধ হয়। ঐতিহাসিক ফিরিশতার বর্ণনা মতে, "জোট বাহিনীতে ২ লাখ অশ্বারোহী এবং ৩,০০০ হস্তি ছিল।" মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ডান, বাম ও মধ্য – এ তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি নিজে মধ্যভাগের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধ শুরু হলো। জোটবাহিনী মুসলিম বাহিনীর ডান ও বাম অংশকে আক্রমণ করে এবং পৃথ্বিরাজের ভাই গোবিন্দরাজ ছিলেন মধ্যভাগে। গোবিন্দরাজের আঘাতে মুহাম্মদ ঘুরী মারাত্মক আহত হন। রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে। বিশ্বস্ত খলজি সৈনিকের সহায়তায় মুহাম্মদ ঘুরী প্রাণে রক্ষা পান এবং নিজ রাজ্যে ফিরে যান।

তরাইনের ২য় যুদ্ধ (১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ): একই স্থানে পরের বছর মুহাম্মদ ঘুরীর সাথে পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে গঠিত জোট বাহিনীর যুদ্ধ হয়।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

মুসলিম সৈন্যসংখ্যা : ১,২০,০০০ সৈন্য। এর মধ্যে সুসজ্জিত, প্রশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খলিত অশ্বারোহীর এক বাহিনী ছিল। ১০,০০০ তীরন্দাজ। ঘুরী ১০,০০০ সৈন্য দিয়ে ৪টি বাহিনী গঠন করেছিলেন। ১২,০০০ অশ্বারোহী দিয়ে তিনি আলাদা একটি বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনী ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ।

পৃথ্বিরাজের সৈন্য: ৩,০০,০০০ সৈন্য। এর মধ্যে সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। ৩০০ হাতি ছিল। ১৫০ জন রাজন্যবর্গ নিয়ে পৃথ্বিরাজের জোটবাহিনী গঠিত ছিল।

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

যুদ্ধ: উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। হিন্দুবাহিনী যখন রণক্লান্ত, তখন মুসলিম ১২,০০০ অশ্বারোহী বাহিনী বেপরোয়াভাবে শত্রু নিধনে লিপ্ত হয়। তীরন্দাজ, অশ্বারোহী এ বাহিনীর আক্রমণে শত্রুপক্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পৃথ্বিরাজের ভাই গোবিন্দরাজ নিহত হয়। পৃথ্বিরাজের মৃত্যুর ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মিনহাজ উদ্দিন সিরাজের মতে, পৃথ্বিরাজকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হয়। ড. হাসান নিজামের মতে, "পৃথ্বিরাজকে আজমিরে নেওয়া হয় এবং রাজদ্রোহের অপরাধে হত্যা হয়।" চাঁদ বরদাই-এর মতে, "পৃথ্বিরাজকে গজনি নেওয়ার পর হত্যা করা হয়।" তবে সতীশচন্দ্র, ঈশ্বরীপ্রসাদ এবং এ বি এম হাবিবুল্লাহর মতে, "যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়ার পথে পৃথ্বিরাজকে বন্দি করা হয় এবং পরে হত্যা করা হয়।"

তরাইনের যুদ্ধের গুরুত্ব: এ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মুসলিম বাহিনী অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তারা একে একে হান্সি, সামান, খুরাম প্রভৃতি দুর্গ দখল করেন। বার্ষিক করদানের শর্তে পৃথ্বিরাজের এক পুত্রের শাসনাধীনে রেখে দেওয়া হয়। এরপর মুহাম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিন আইবেকের হাতে ভারতবর্ষের শাসনের ক্ষমতা অর্পণ করে গজনিতে ফিরে যান। এ যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকজন ইতিহাসবিদের বক্তব্য হলো-

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

ভি. ডি. মহাজনের মতে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ একটি মাইলফলক। ভারতীয় রাষ্ট্রগুলোর বিপক্ষে মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত করে। প্রফেসর কে. এ. নিজামী (Prof. K. A. Nizami)-এর মতে, মুহাম্মদ ঘুরীর পদপ্রান্তে গোটা চৌহান রাজ্য লুটিয়ে পড়ে। এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহর মতে, এ বিজয়ে গোটা চৌহান রাজ্য মুইজউদ্দিনের পদপ্রান্তে চলে আসে।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

তরাইনের যুদ্ধের ফলাফল: ভারতবর্ষের ইতিহাসে তরাইনের ২য় যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যেমন-

মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা: তরাইনের যুদ্ধ ছিল ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের ওপর নির্ভর করেছিল মুসলমানগণ ভারত শাসন করবে কিনা। কারণ মুহাম্মদ ঘুরীর লক্ষ্য ছিল ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপন। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "He conquered the country and aimed at permanent settlement."" অর্থাৎ, (মুহাম্মদ ঘুরী) বিজিত অঞ্চলে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তরাইনের ২য় যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী হিন্দু সামরিক নেতাদের হত্যা করেন। এতে হিন্দুদের সামরিক বাহিনী ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি।

মুসলিমদের ক্ষমতা বৃদ্ধি: তরাইনের ২য় যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী, একে একে বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেন।

তারা হানসি, খুরাম, সামান, আজমির দখল করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ শাসন পরিচালনার জন্য কুতুবউদ্দিন আইবেকের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গজনিতে ফিরে যান। কুতুবউদ্দিনের নেতৃত্বে ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ মিরাট, দিল্লি, কোইল (বর্তমান আলীগড়) মুসলমানদের দখলে আসে। কুতুবউদ্দিন দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন করেন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী চান্দেয়ার যুদ্ধে কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রকে পরাজিত করেন। একটি তীর জয়চন্দ্রের চোখে লাগে। এ আঘাতে তিনি মারা যান। অশনি (Asni) দুর্গে রক্ষিত জয়চন্দ্রের ধনসম্পদ মুহাম্মদ ঘুরী নিজে হস্তগত করেন। এরপর তিনি বেনারস দখল করেন। ভি. ডি. মহাজনের বর্ণনামতে, ১৪,০০০ উট ভর্তি ধনসম্পদ মুহাম্মদ ঘুরী অর্জন করেন। ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বদাউন, গুজরাট, মালব এবং ১২০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দে কালিঞ্জর মুসলমানদের দখলে আসে। এভাবে ভারতের একটি বৃহৎ অংশ মুসলমানদের দখলে আসে।

নতুন সামরিক আদর্শ: হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র – এ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধ করার দায়িত্ব ছিল ক্ষত্রিয়দের। তাই সেনাবাহিনীতে শুধু ক্ষত্রিয় বংশ থেকে নিয়োগ দেওয়া হতো। বাকি তিন শ্রেণির লোকজন দেশের প্রয়োজনে সামরিক সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন মনে করত না। অপর তিন বর্ণের লোকজন মনে করত যে, দেশরক্ষায় তাদের কিছুই করার নেই। তুর্কিরা সৈনিক হওয়ার অধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। সামন্তদের নিকট হতে সেনা সংগ্রহের প্রথা বাতিল হয়ে যায়। সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা, বেতন দেওয়া ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হয়।

মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যু: খোক্কার জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ফেরার পথে ঝিলাম নদীর তীরে দামিয়াক নামক স্থানে খোক্কার বংশীয় জনৈক আততায়ীর হাতে মুহাম্মদ ঘুরীর ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মমভাবে নিহত হন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর সাফল্যের কারণ

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং সুলতান মাহমুদ অসীম বীরত্ব এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়েও ভারত উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম রাজত্ব কায়েম করতে পারেননি। কিন্তু মুহাম্মদ প্রকৃত বিজেতা এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন। মানুষ হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরি অনুপম চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। দৃঢ় মনোবল, আত্মপ্রত্যয়, ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও দানশীলতা তার উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিশত তাকে আল্লাহভীরু, সত্যনিষ্ঠ এবং প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে অভিহিত করেছেন। মুহাম্মদ ঘুরীর অসামান্য সামরিক সাফল্যের মূলে কতিপয় কারণ ছিল; যেমন-

প্রথমত, এসময় ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব-কলহ বিরাজমান ছিল। মূলত রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক অনৈক্য মুসলিম বাহিনীর সফলতার অন্যতম কারণ। ভি. ডি. মহাজন বলেন, "There was no one paramount power in the country at that time which could fight against the Muslims."

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর সাফল্যের কারণ

দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের উন্নত যুদ্ধকৌশল, সামরিক দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং অপূর্ব শৃঙ্খলা বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে। অপরদিকে, হিন্দুদের ত্রুটিপূর্ণ সনাতন যুদ্ধনীতি; সেকেলে যুদ্ধাস্ত্র ও অনুন্নত রণকৌশল তাদেরকে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেয়। তদুপরি তাদের মন্থরগতিসম্পন্ন হস্তিবাহিনী মুসলিমদের ক্ষিপ্রগতির অশ্বারোহী বাহিনীর ক্ষিপ্র আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা হিন্দুদের মধ্যে চরম বৈষম্য তৈরি করেছিল। অপরদিকে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের মধ্যে সংঘবদ্ধ আক্রমণে প্রাণিত করে। ফলে মুসলিমরা সহজেই বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হন।

চতুর্থত, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং গণিমতের মাল লাভের আকাঙ্ক্ষা সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত সাহসী করে তুলেছিল। ফলে হিন্দু শক্তি সহজেই পরাজয় বরণ করে।

পঞ্চমত, মুসলমানদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক, বখতিয়ার খলজির মতো বহুসংখ্যক সুদক্ষ সেনাপতির আবির্ভাব ঘটেছিল। যারা যুদ্ধের ময়দানে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত করেছিল।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর সাফল্যের কারণ

ষষ্ঠত, ভারতের অফুরন্ত ধনসম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা মুসলমানদের ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করে এবং বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় রাজন্যবর্গের অনৈক্য কঠোর জাতিভেদ প্রথা ও নিম্নশ্রেণির অসন্তোষ মুসলিম বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব

রাজ্য বিস্তার: মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজ কৃতিত্বে গজনি সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর ঘুর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি রাজ্য জয় করেছেন, স্থায়িভাবে শাসনের ব্যবস্থা করেছেন এবং টেকসই শাসনের জন্য কার্যকর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। ভারত জয় করে এর গুরুদায়িত্ব তুলে দেন কুতুবউদ্দিনের ওপর। তিনি তার প্রয়োজনে সামরিক সহযোগিতা করেছেন। তাই বলা যায়, তিনি ছিলেন প্রকৃত রাজ্য বিজেতা। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "Muhammad was a real conqueror."

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব

ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা: মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তার লক্ষ্য ছিল ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং কোনো পরাজয়ে হতোদ্যম না হয়ে লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল দৃঢ়তার পরিচয় দেন। যার ফলে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। সামরিক নৈপুণ্যের মাধ্যমে তিনি বাংলা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ভারতে তিনি যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন তা প্রায় ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়, একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বস্তুত সামাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম করে মুহাম্মদ ঘুরী ইতিহাসে স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছেন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব

সমরবিদ: মুহাম্মদ ঘুরী একজন শ্রেষ্ঠ সমরবিদ ছিলেন। তাঁর যুগে সামরিক প্রতিভা ও রণকুশলতা ব্যতীত সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। Might is right (জোর যার মুল্লক তার) নীতির ওপর তৎকালীন, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সকল যোদ্ধাদের কৃতিত্বকে ছাপিয়ে নিজের কৃতিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব। তিনি নিজে যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিতেন। এতে সৈন্যরা উৎসাহিত হতো।

রাজনীতিবিদ: মুহাম্মদ ঘুরী সামরিক ও বেসামরিক সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি রাজনৈতিক দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে মাত্র ৩০ বছর বয়সে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ বি এম হাবিবুল্লাহ বলেন, "He was practical statement." অর্থাৎ, তিনি বাস্তবমুখী রাজনীতিবিদ ছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক জ্ঞান উল্লেখ করে ভি. ডি. মহাজন বলেন, "Mohammad Ghuri was a shrewd diplomat who could deal with every type of friend or foe. He saw the weakness of his enemies. অর্থাৎ, মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শত্রু বা মিত্রদের সাথে কূটনৈতিক দক্ষতায় আচরণ করতে পারতেন। তিনি তার শত্রুদের দুর্বলতাগুলো দেখেছিলেন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব

নিপুণ রণকৌশলী: মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একের ভেতর অনেক। তিনি যেমন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন তেমনি একজন নিপুণ রণকৌশলী ছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ডান, বাম, মধ্য, অগ্রবর্তী দল এবং রিজার্ভ সেনা-এ পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে ছিলেন উন্নত যুদ্ধকৌশল, সৈন্য পরিচালনায় অপূর্ব দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা, ক্ষিপ্রতা ও *গতিশীলতা। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, "The element of mobility was totally absent from the Indian armies." অর্থাৎ, ভারতীয় সেনাদলে মোটেও গতিশীলতা ছিল না। এছাড়া মুহাম্মদ ঘুরী ভারতীয়দের হাতির মন্থর গতির পরিবর্তে ঘোড়ার গতিশীলতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

সুশাসক: মুহাম্মদ ঘুরী একজন প্রজাবান্ধব শাসক ছিলেন। তিনি স্বজনপ্রীতির পরিবর্তে যোগ্যতাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি ক্রীতদাসের প্রতি সদয় ছিলেন এবং তাদের আনুগত্যের ওপর আস্থা রাখতেন। ক্রীতদাসেরা কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা ও কর্মগুণে উচ্চপদে আসীন হতেন। মানবচরিত্র সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এজন্য তিনি রাজ্য জয় করার সাথে সাথে প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে নিতেন না। উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগ দিতেন। জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। রাস্তাঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তিনি জনকল্যাণে নির্মাণ করতেন। জনদুর্ভোগ দূর করতে তিনি সর্বদা মনোযোগী ছিলেন।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরীর চরিত্র

মুহাম্মদ ঘুরী একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ধর্মান্ধতা ছিল না। তিনি তার পারিবারিক মুরব্বিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তার উজ্জ্বল চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তিনি তার অনুচর ও জনগণের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ইসলামের অনুশাসনগুলো মেনে চলতেন। তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। এ বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন যে, তার একটি বা দুটি নয়, কয়েক শ পুত্র সন্তান রয়েছে। যারা তার সাম্রাজ্য রক্ষা করবে। তার পুত্র সন্তানের অভাবকে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এ মানসিকতা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সুখী ছিলেন। তিনি পরধর্মে সহিষ্ণু ছিলেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি ন্যায়বিচার ও উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বিরাজের নিকট হতে আজমির দখল করে পৃথ্বিরাজের পুত্রকেই নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে শাসক নির্বাচন করেন। তিনি হিন্দুদের জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথাকে অপছন্দ করতেন। এছাড়া তিনি সতীদাহ প্রথার ঘোর বিরোধী এবং বিধবা বিবাহের বিশ্বাসী ছিলেন। সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করা বিশেষ শ্রেণির (ক্ষত্রিয়দের) জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে বর্ণ, গোত্র, জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। জ্ঞানীদের শ্রদ্ধা করা, সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নয়ন সাধন করা ছিল তার সহজাত প্রবৃত্তি। বিখ্যাত দার্শনিক ফখরুদ্দিন রাজি এবং প্রখ্যাত কবি নিজামি উরুজি ছিলেন তার দরবারের অন্যতম সদস্য।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

সুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ঘুরীর তুলনা

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান মাহমুদ এবং মুহাম্মদ ঘুরীর মধ্যে একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, উভয় নরপতিই শৌর্যবীর্য ও রণনৈপুণ্যে পারদর্শী ছিলেন। তবে সেনাপতি ও সমরনায়ক হিসেবে সুলতান মাহমুদ ছিলেন অপরাজেয় বিজেতা। তিনি যুদ্ধে কখনো পরাজিত হননি। অন্যদিকে, মুহাম্মদ ঘুরী গুজরাট, তরাইনের প্রথম যুদ্ধ এবং মধ্য এশিয়ার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন।

দ্বিতীয়ত, সুলতান মাহমুদ গজনি রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহপূর্বক গজনিতে ফিরে যান। ভারতে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনো আকাঙ্ক্ষাই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে, মুহাম্মদ ঘুরী স্থায়িভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ভারত আক্রমণ করেন এবং তিনি সফলতা লাভ করেন।

তৃতীয়ত, সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ ধর্মান্ধ নীতির দ্বারা পরিচালিত ছিল। অপরপক্ষে, মুহাম্মদ ঘুরী, এক্ষেত্রে উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তবে ধর্মান্ধ ছিলেন না।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী

সুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ঘুরীর তুলনা

চতুর্থত, উভয় শাসকই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে মুহাম্মদ ঘুরী অপেক্ষা সুলতান মাহমুদ অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে ঘুরীর অবদান সুলতান মাহমুদ অপেক্ষা অনেক বেশি। ভারতে আক্রমণকারী হিসেবে নয় বরং স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঘুরী বংশের পতন: মুহাম্মদ ঘুরী নিঃসন্তান হওয়ায় তার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও অযোগ্য শাসক। তার দুর্বলতার সুযোগে মুহাম্মদ ঘুরীর সহযোগী তাজউদ্দিন ইলদুজ গজনি, নাসির উদ্দীন কুবাচা সিন্ধু এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অযোগ্য শাসক মাহমুদ ঘুরীর পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অতঃপর মাহমুদ ঘুরীর মৃত্যুর পর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গৃহবিবাদ শুরু হলে খাওয়ারিযম শাহ ঘোর রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নেন। ফলে ঘুরী বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

টপিক – ০৫ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক ০৫: অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

>নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর [সকল বোর্ড '১৮]

৩,৪০০ মাইল সমুদ্র সমতট সংবলিত ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বাস। আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে আধুনিককালে ইউরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত বহু জাতি ভারতে প্রবেশ করেছে। প্রাচীন যুগে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক প্রভৃতি; মধ্যযুগে আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং আধুনিক যুগে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে আগমন করে। ফলে ভারতবর্ষ এক মহামানবের সাগরে পরিণত হয়েছে। মূলত এজন্যই ঐতিহাসিক স্মিথ ভারতবর্ষকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলে আখ্যা দিয়েছেন।

> সতীদাহ প্রথা [ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '১৭; চ. বো. '১৭]

স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় স্ত্রীকে দাহ করার প্রথাকে সতীদাহ প্রথা বলে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় যদি স্বামী মারা যেত তবে ঐ স্বামীকে যে চিতায় দাহ করা হতো জীবন্ত স্ত্রীকেও ঐ চিতায় দাহ করা হতো। এ প্রথা সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। রাজা রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৬৩ সালে ইংরেজ গভর্নর লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

জওহর ব্রত

[ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২১; য. বো. '২১;]

মুসলমানদের হাতে যুদ্ধবন্দি হওয়া থেকে রক্ষা পেতে রাজা দাহিরের স্ত্রী জওহর ব্রত পালন করেন। সিন্ধুর রাজা দাহির মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে পরাজিত হলে তার স্ত্রী রানীবাঈ রাওয়ার দুর্গে ১৫০০০ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু পরাজয় যখন অনিবার্য তখন রানীবাঈ মুসলমানদের হাতে বন্দি হওয়া থেকে ধর্মমতে আগুনে আত্মাহুতি দেওয়াকে শ্রেয় মনে করে জ্বলন্ত আগুনে লাফ দিয়ে জওহর ব্রত পালন করেন।

জাহানসুজ [সি. বো. '২১; ব. বো. '২১]

ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে আলাউদ্দিন গজনি দখল করে ৭ দিন ৭ রাত ধ্বংসযজ্ঞ চালান এজন্য তাকে জাহানসুজ বলা হয়। জাহানসুজ অর্থ পৃথিবী ধ্বংসকারী। ঘুর নেতা আলাউদ্দিন হোসেন ১১৫১ খ্রিষ্টাব্দে গজনি আক্রমণ করেন। কেননা গজনির শাসক তার দুই ভাইকে হত্যা করেছিল। তিনি গজনি দখল করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৭ দিন ৭ রাত গজনি শহর অগ্নিদগ্ধ করার মাধ্যমে ধ্বংস করেন। যার কারণে তাকে জাহানসুজ বলা হয়।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

> সোমনাথ মন্দির

[ঢা. বো. '২১; রা. বো. ১২:১; য. বো. '২১]

সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির অভিযান ও ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজয় ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে খুবই বিখ্যাত। সুলতান মাহমুদ ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের কাথিওয়ারের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত সোমনাথ মন্দিরে অভিযান চালান। ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে এ মন্দির তার আয়ত্তে আসে। এ মন্দির রক্ষা করতে গিয়ে ৫০০০ হিন্দু নিহত হয় এবং সুলতান মাহমুদ দুই কোটি দিনার, মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরত ও ধনসম্পদ লাভ করেন। হিন্দুদের ব্যাপক শ্রদ্ধেয় এ মন্দিরের পরাজয় ঘটলে তাদের ধর্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সুলতান মাহমুদ প্রচুর অর্থ হস্তগত করেন।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

শাহনামা [সি. বো. '২১; ব. বো. '২১]

মহাকবি ফেরদৌসি রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য হলো 'শাহনামা'। মহাকবি ফেরদৌসি গজনির সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন। সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসিকে একটি মহাকাব্য রচনা করতে বলেন এবং বিনিময়ে প্রতিটি শ্লোকের জন্য একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তার অনুরোধে ফেরদৌসি 'শাহনামা' রচনা করেন এবং এতে ৬০,০০০ শ্লোক হয়। সুলতান মাহমুদ উজিরদের কুমন্ত্রণায় তাকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ৬০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা দেন। এতে মহাকবি ফেরদৌসি মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং সুলতান মাহমুদের দরবার ছেড়ে চলে যান। পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদ তার ভুল বুঝতে পারেন এবং মহাকবির জন্য ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পাঠান। কিন্তু ততক্ষণে মহাকবি ফেরদৌসি পরপারে চলে গেছেন।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা

> আল বেরুনি

আল বেরুনি ছিলেন একজন কালোত্তীর্ণ, স্বনামধন্য, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা সর্বোপরি কুরআন-হাদিসের ওপর তার জ্ঞান ছিল অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাকে বলা হতো সুলতান মাহমুদের রাজসভার নক্ষত্র। ভারতের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে তিনি গজনিতে নিয়ে যান। ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত।

> জাতিভেদ প্রথা

হিন্দুধর্মের সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জাতিভেদ প্রথা। নৈতিক আচরণ ও পেশার ভিত্তিতে হিন্দুধর্মে এ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত অর্থে জাতিভেদ বলতে হিন্দু সমাজের স্তর বিভাগকে বোঝায়। তবে বিশেষভাবে একে হিন্দুধর্মের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চারটি স্তর হলো- ১. ব্রাহ্মণ, ২. ক্ষত্রিয়, ৩. বৈশ্য ও ৪. শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ এবং শূদ্রদের সর্বনিম্ন পর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১ যমুনার এক পাশে টাঙ্গাইল ও অন্য পাশে সিরাজগঞ্জ জেলা অবস্থিত। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গাচরের লোকেরা অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ছিল। একদিন সিরাজগঞ্জের এক জেলে নদীতে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল। এমন সময় এলেঙ্গাচরের কিছু লোক এসে নৌকাসহ মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলা চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি এলেঙ্গাচরের উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ এবং ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি জানান। এলেঙ্গাচরের উপজেলা চেয়ারম্যান জানান ডাকাতদের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি ক্ষতিপূরণ ও ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি অস্বীকার করেন। ফলে সিরাজগঞ্জ এলাকার লোকজন এলেঙ্গাচরবাসীর ওপর হামলা চালায়।

ক. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী?

খ. রাজা দাহিরের স্ত্রী 'জওহর ব্রত' পালন করেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবিষয়ের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৩]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ৩ অজয়নগর ও বিজয়নগর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গ্রাম। শাহাদৎ সাহেব অজয়নগর গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি, অন্যদিকে আমিন সাহেব বিজয়নগরের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। দুই জনেরই শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী আছে, যারা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে শাহাদৎ সাহেবের এলাকা থেকে আমিন সাহেবের লোকজন শস্য ও গবাদি পশু জোর করে নিয়ে যায়। শাহাদৎ সাহেব আমিন সাহেবের কাছে এর বিচার চান। আমিন সাহেব তাতে কর্ণপাত করেননি। এতে শাহাদৎ সাহেব রাগান্বিত হয়ে আমিন সাহেবের এলাকায় হামলা চালায়। আমিন সাহেব তা প্রতিহত করতে গিয়ে পরাজিত হন এবং তিনি নিজেও প্রাণ হারান।

ক. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত?

খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শস্য ও গবাদি পশু জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার সাথে সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত ঘটনাটি সিন্ধু বিজয়ের একমাত্র কারণ নয়।'- বিশ্লেষণ কর।

[য. বো. '১৭; কু. বো. '১৭; সি. বো. '১৭; ব. বো. '১৭; দি. বো. '১৭]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ৪ ফরাসি সরকারের সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশর বিজয় করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন ও ফরাসিরা বেশিদিন মিশরে অবস্থান করতে পারেননি। তবে মিশরের ইতিহাসে এ বিজয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক. রাজা দাহিরের স্ত্রীর নাম কী?

খ. ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সম্রাট নেপোলিয়নের মিশর বিজয়ের সাথে আরবদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত বিজয়ের ফলাফল উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '২২; চ. বো. '২২; সি. বো. '২২; ব. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. ভারত কোন মহাদেশে অবস্থিত?
ক. এশিয়া খ. আফ্রিকা গ. ইউরোপ ঘ. আমেরিকা

২. কার নাম থেকে ভারত বা ভারতবর্ষ নামটি এসেছে?
ক. রাজা ভজদ্বার খ. রাজা ভরত গ. রাজা ভামণ ঘ. রাজা ভাগ্যদাস

৩. কোন শব্দটির থেকে ইন্ডিয়া শব্দের উৎপত্তি ঘটে?
ক. ইন্দাচ খ. ইন্দাস গ. ইন্দাফ ঘ. ইন্দাক

৪. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী কারা? সকল বোর্ড '২১, '১৮)
ক. আর্য খ. শক গ. হুন ঘ. দ্রাবিড়

৫. ভারত উপমহাদেশকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলে অভিহিত করেন কে?
ক. ইবনে বতুতান খ. ভিনসেন্ট স্মিথ গ. মাহুয়ান ঘ. হিউয়েন সাং

৬. ভারতবর্ষে কতটি ভাষা প্রচলিত আছে?
ক. ১৭৯টি খ. ১৮০টি গ. ১৮১টি ঘ. ১৮২টি

৭. কে ভারত উপমহাদেশকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন?
ক. হুইট খ. ভিনসেন্ট স্মিথ গ. হেরোডোটাস ঘ. টয়েনবি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮.কোন বন্দরে আরব জাহাজ লুট হয়েছিল?

ক. আলোর খ. দেবল গ. কালিকট ঘ. সিসিলি

৯. জালালাবাদ ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তীতে কোন গিরিপথ অবস্থিত?

ক. বোলান গিরিপথ খ. খাইবার গিরিপথ

গ. তাকলামাকান গিরিপথ ঘ. ডুরান্ড গিরিপথ

১০. সিংহলের বর্তমান নাম কী?

ক. শ্রীলঙ্কা খ. সিলোন গ. তামিলনাড়ু ঘ. গুজরাট

১১. রাজা দাহিরের স্ত্রীর নাম কী ছিল?

ক. লক্ষ্মীবাঈ খ. জয়া রাণী গ. মিত্রা রাণী ঘ. রাণীবাঈ

১২. খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসক কে ছিলেন?

ক. রাজা দাহির খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

গ. মুহাম্মদ বিন কাশিম ঘ. কোতায়বা বিন মুসলিম

১৩. খলিফা ওয়ালিদের সাম্রাজ্যবাদী গভর্নর কে ছিলেন?

ক. কুতাইবা খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

গ. তারিক বিন জিয়াদ ঘ. মুসা বিন নুসাইর

THANK YOU